রহস্যময় অট্টালিকা

প্রথম দর্শনেই বাড়িটাকে ভালো লাগেনি শিশিরের, কীরকম একটা খটকা লেগেছিল। ওর মন বলেছে, উঁহু এর লক্ষণ তো ভালো না! এখন এর আগাপাশতলা লক্ষ করে—এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যতটা সুচারুরূপে দেখা সম্ভব—দেখেশুনে ওর সেই সংশয় আরো দৃঢ়ই হল।

লিলিকে পাশে ডেকে স্পষ্টই ও জানিয়ে দিয়েছে ঃ "বাড়িটার হাবভাব ভালো নয়।"

দাদার কথায় লিলিরও মনে খটকা লেগেছে, বাড়িটার সম্বন্ধ তত নয়, কথাটার সম্বন্ধেই। দাদার কথাটা কেমন যেন হল না? বাড়ির আবার হাবভাব কী? নির্জীব প্রাণীর কখনো হাবভাব হয় নাকি? হতে পারে কখনো? কথাটার কোথায় যেন ব্যাকরণে বেঁধে গেছে।

লিলিও তার সংশয়টা ব্যক্ত করেছে।

"ঠিকই বলেছি।" শিশির আরো সুদৃঢ় ঃ 'বাড়িটার গতিবিধি সুবিধের নয়।'

"গতিবিধি? তুমি কী বলচদাদা? বার বার কী বলচ? ভারী বাড়াবাড়ি করচ তুমি।" লিলি ফের আপত্তি জানায় ঃ বরং 'বলতে পারো যে গতিকসতিক'।

'ও একই কথা!' শিশির বলে ঃ 'দেখচিস না, কী রকম জরাজীর্ণ এই বাড়িটা! আমি নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে হাজার বছর আগেকার গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকনো রয়েছে। কত মণিমাণিক্য হিরে জহরত কোনো এক অন্ধকার কোণে চামচিকেদের সঙ্গে ঠাসাই হয়ে নির্বিবাদে বসবাস করছে। তা না হলে বাড়ির হালচাল এমন হয়?'

লিলি চোখ বড়ো বড়ো করে চেয়ে থাকে, কিছু বলে না। বলতে পারে না। হাঁ করে থাকে।

'আমি তাই বলি! কেন যে মামা অমন সাধের দেশ-ঘর ছেড়ে, এত দূরে এই বিদেশে বর্মা মুলুকে এসে এতদিন ধরে এই বাড়ি কামড়ে পড়ে আছেন, এতক্ষণে বুঝলুম!—'

শিশির আরও কিছুক্ষণ হয়তো গবেষণা চালাত, আরো খানিক, তার সদ্যপ্রসূত আবিষ্কার, লিলির হাঁ-র ভেতর দিয়ে চালান দিত, কিন্তু এর মাঝখানে মামার হাঁকডাক এসে বাধা দ্যায়।

নেপথ্য থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ঃ

"এই বেলা! বেলা! বেলা না লিলি—শিশির, চা খাবি আয়! এই বেলা আয়!"

চায়ের নাম শুনলে শিশির আর দাঁড়ায় না, দাঁড়াতে পারে না। চিরকালই তার এই অক্ষমতা। চা-র গন্ধ পেলে তো আর কথাই নেই—মাছের চারে পাওয়ার মতোন—আপনা থেকে সে ধরা দেবে। এমনকী, লিলিও, এখন পর্যন্ত যে দাদার বাক্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেও আর নিজেকে স্থগিত রাখতে পারে না। এক মুহূর্ত দেরি না করে দাদার পিছনে পিছনে দৌড় মারে!

দুমদাম করে তারা ছুটে চলে। টপাটপ সিঁড়ি টপকে হুড়মুড় করে উঠতে থাকে। কাঠের সিঁড়ি, পুরোনো সাবেক কালের, তাদের পদভারে মচমচ করতে শুরু করে।

সেই মচমচানি ব্রজেশ্বর বড়ুয়ার কানে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি খচ্‌খচ্‌ করতে থাকেন ঃ 'ঘরদোর সব ভাঙল দেখচি! সারল দেখচি সব!'

চায়ের পাত্র হাতে আপন মনেই তিনি ঝঙ্কার দ্যান।

ছুটতে ছুটতে উঠতে উঠতে, সিঁড়ির মোড় ঘুরবার মুখে, রেলিংয়ের বাঁকের কাছে শিশির ধাক্কা খায়, হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় শিশির। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা হয়, ধরণী যেন দ্বিধা হয়ে, তার একখানা পা—যে পা-টা অগ্রণী হয়ে গেছল, সেই পা খানাকেই হঠাৎ গ্রাস করে ফ্যালে।

শিশিরের মনে হল, পড়ে যেতেই, তার অধঃপতনের ভারে সিঁড়ির সেই জায়গাটা যেন ফাঁক হয়ে গেল, আর তার গর্তের মধ্যে তার একখানা পা হঠাৎ সেঁধিয়ে গেল—বেমালুম শূন্যের ভেতর দিয়ে গলে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি আর কি!

বিস্মিত শিশির দুহাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ে। উঠে আরো বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যায়। কোথায় গর্ত, কোথায় কি! তেমনি জমাট সিঁড়ি, কাঠ মিলানো নিটোল দেহ নিয়ে তেমনি জমজমাট! পা ঠুকলে তেমনি খটখট করছে!

"অ্যাঁ? এ কী হল? এ আবার কী হল?" অস্ফুট কণ্ঠে বলল শিশির।

'কী হল দাদা?' লিলি পেছন থেকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'খুব লাগল নাকি?'

'ও বাবা! এ বাড়ির আরো গুণ আছে দেখচি।' শিশির জবাব দ্যায় ঃ 'ভূতুড়ে বাড়িও বলা যায়!'

'ভূতুড়ে—!' ভূতের নামে লিলি ডরিয়ে ওঠে।

'পদচ্যুত হয়ে গিয়েছিলাম আর কি! পাখানা গিলে বসেছিল আমার। বলব কি, এই সিঁড়িখানাই, —বুঝলি লিলি! ভারী আশ্চর্যি।' শিশির বলে, তখনো তার কণ্ঠ বিস্ময়াবিষ্ট ঃ 'বাব্‌বাঃ, পাখানা হাতিয়ে নিয়েছিল আমার আরেকটু হলে!'

'ভূতে? ভূতে নাকি?' লিলির নিজের পা কাঁপতে থাকে।

'বলব তোকে এক সময়ে। আগে চা জুড়িয়ে গেল, চ।'

ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে এই বাড়ির মিলন আজকের নয়। বছর দশেক আগেকার কথা। এই রাজযোটকের গোড়ায় একটুখানি ইতিহাস আছে—এবং সেই ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলও খানিকটা জড়ানো।

বছর দশেক আগে, ব্রজেশ্বরবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনি পদব্রজে ভূপর্যটন

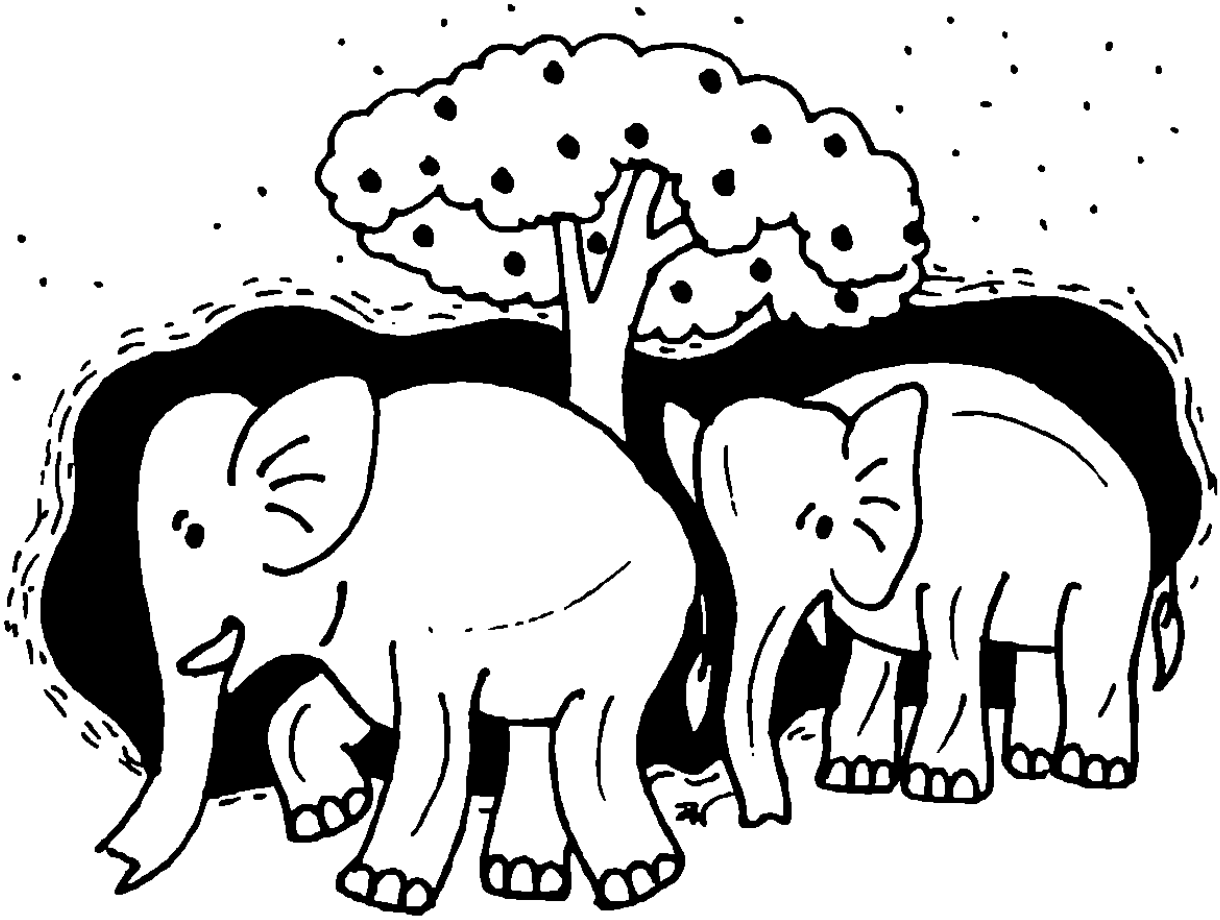

নিন্দাবাদ রটাবেন—অনেক গালমন্দ দেবেন নিঃসন্দেহে। অতএব ওঁকে হজম করা সমীচীন হবে না।

অতএব ব্রজেশ্বরকে ওরা ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে, সেই প্রতিবাদকারীকেই ওঁর পাতে পরিবেশন করে (যদিও সামান্য ভগ্নাংশে), পরিতুষ্ট করে ওঁকে ছেড়ে দিয়েছে।

এবং ব্রজেশ্বরও নিমকহারাম নন। তিনিও সভ্যজগতে ফিরে এসে, এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলেননি। নিন্দাবাদ দূরে থাক—কোনো উচ্চবাচ্যই করেননি। একবার যাকে, যাদের একজনকে গালে তুলেছেন, তাদেরকে তিনি গাল দেবেন কোন্ মুখে?

তবে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে, এই যে, দাঙ্গা ফ্যাসাদে যুদ্ধবিগ্রহে এত এত লোক ক্ষয় হয়, না হোক এত মানুষ মারা পড়ে, এদের যদি, মানে, হাঙ্গামা-টাঙ্গামা চুকে গেলে, রেঁধে বেড়ে সাবড়ে দেবার কোনো উপায় থাকত তাহলে হয়তো নেহাত মন্দ হত না। সমস্ত ব্যাপারটার তাহলে একটা অর্থ হত, সদর্থই হত একেবারে নিরর্থক হত না, এতখানি রক্তপাত নিতান্তই ব্যর্থ হত না, মাংস পাতে সার্থক হয়ে উঠত। কিন্তু এ যা হচ্ছে এ যে একেবারেই অকেজো, বাজে খরচ, সমস্তটাই বরবাদ; এর কি কোনো মানে হয়? অনর্থক বৃথা অপচয় বইত না? ব্রজেশ্বরের সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা অনেক বেশি উপাদেয়, ঢের সুস্বাদু—এই কথাই ওঁর মনে হয়েচে। মনে হয়েচে আর উনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেচেন আর নিজের জিভ চেটেছেন। তবে কেবল মাঝে

মাঝেই—এই যা! সেই নরখাদকের তার তিনি ভুলতে পারেননি! তার কথা চিরদিনের জন্য তাঁর স্মৃতিপটে খোদাই হয়ে গেছে।

পথভ্রষ্ট এই সব উপদ্রব উৎপাত অনায়াসেই তিনি এড়াতে পেরেছিলেন, এসব তো ঘটবেই এবং কেটেও যাবে। কেটে-কুটে না গেলেই হল। এবং ঠিক যেমনটি ঘটে থাকে, সাধারণত সব পরিব্রাজকের ডায়েরিতেই দেখা যায়, তার কিছুতেই—কোনোখানেই তাঁর ব্যত্যয় ঘটেনি। একটুও না। সবই তিনি পেয়েছিলেন এবং পেরিয়েছিলেন—অবলীলাক্রমেই। কেবল এই ডাকাতরাই তাঁকে ছেড়ে কথা বলেনি।

তারা বলেছে, বাপু, তুমি একটি ভূপর্যটক। বলতে হবে না, দেখেই টের পেয়েছি। তা বাপু, তুমি যেখানেই যাবে বক্তৃতা ঝাড়বে, অটোগ্রাফ ছাড়বে, আর টাকা মারবে। তোমার এত টাকা খাবে কে? আমরা তোমাকে প্রাণে মারতে চাইনে, কেন না তোমাদের মারলে আমাদের লোকসান। তোমরাই আমাদের বন্ধু—হিতৈষী উপকারক—রোজগারের উপায়—তোমরা মলে টাকার থলে নিয়ে এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে এই সব বিপজ্জনক পথে ভূপর্যটন করবে কারা? তোমাদের খতম করলে আমাদেরই ক্ষতি। তোমাদেরও দফারফা আর সেই সঙ্গে আমাদেরও ব্যবসা মাটি। না বাপু, সেটি হচ্ছে না। তোমাকে মেরে ফেলব এ যদি ভেবে থাকো তাহলে ভুল করেছ। যেমন প্রাণ হাতে নিয়ে বেরিয়েছ, তেমনি প্রাণ হাতে করে ফিরে যাও। কেবল সম্মিলিত এক যৌথ কারবারের যেটা আমাদের লভ্যাংশ, আমাদের ভাগ্যের লাভ, সেইটা আগে ফ্যালো দিকি! তার জন্যেই তো এত কষ্ট করে ঘাঁটি গেড়ে মশার কামড় খেয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে ওত পেতে বসে থাকা—কবে কালেভদ্রে তোমাদের এক-আধজন ছিটকে ছটকে এই পথে ভুলে এসে পড়বে। সুবোধ বালকের মতোই এসে যাবে। তা নইলে আর কোন শিকারের আশায় এতখানি ত্যাগস্বীকার? বল, তুমিই বলো!

ব্রজেশ্বর? ব্রজেশ্বর আর কী বলবে! মুখটি বুজে ওর পুঁজিপাটা যা কিছু ছিল, যা নিয়ে বেরিয়েছিল সবই সেই বনদস্যুদের হাতে গুঁজে দিয়েছে।

এত ফাঁড়া কাটিয়ে এসে অবশেষে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে ব্রজেশ্বরকে পথচারী পদব্রজেশ্বরকে সর্বস্বান্ত হয়ে পথেই বসতে হয়েচে।

লিলি হাঁ করে মামার ভোজন-বিলাসিতা দেখছিল। প্রাতরাশে বসে বারোখানা টোসট গোগ্রাসে উড়িয়ে দেওয়া সহজ কথা নয় এবং এও মামার প্রথম কিস্তি না। খুব ভোরে যখন উনি স্টেশন থেকে ওদের আনতে গেছলেন, সেই সময়ে রেলওয়ে কেবিনে, এক সঙ্গে জড়ো হয়ে 'আর্লি টী'র মারফতে ইতিমধ্যেই ওঁর একপ্রস্থ হয়ে গেছল—তারপরে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, নিজের বাড়িতে বসে বিশেষ তোড়জোড়ের সঙ্গে তাঁর এই দু-নম্বর ব্রেকফাস্ট।

লিলি হাঁ করে মামার খাবার বাহাদুরি দেখছিল আর মাঝে মাঝে এক ফাঁকে নিজের

হাঁ-এর মধ্যে বিস্কুটের টুকরো ভেঙে ভেঙে রপ্তানি করছিল, এমন সময়ে শিশির একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে উঠল।

শিশির এতক্ষণ নিজের মনে কী যেন ভাঁজছিল, কোনো দিকে তাকায়নি, একটিও কথা বলেনি। যত রাজ্যের ভাবনা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে গরম গরম চাখছিল যেন। হঠাৎ যেন চা চলকে, চায়ের পাত্রে তুফান তুলে, একটা প্রশ্নের ঢেউ মাঝখান থেকে তার মর্মস্থল ভেদ করে উঠল।

আচ্ছা মামা, তুমি কোনো নকশা পাওনি? জিজ্ঞেস করল শিশির।

নকশা? কীসের নকশা?

এই বাড়ির কোনো চোরাকুঠরির? যেখানে গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকোনো রয়েছে।

এ বাড়িতে চোরকুঠরি আছে কে বললে তোকে? তুই কী করে জানলি যে এখানে ধনভাণ্ডার লুকোনো আছে? ব্রজেশ্বর সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকান।

এই আন্দাজ করছি। এরকম থাকে কিনা। শিশির কৈফিয়ত দ্যায়ঃ য়্যাডভেঞ্চারের বইয়ে কতই তো এমন পড়া যায়।

উঁহু, বইয়ে পড়ার কথা নয়। মামা খুঁত খুঁত করেন তবুঃ খুব খারাপ কথা। ভারী ভীষণ কথা এসব।

তুমি তাহলে কোনো নকশা পাওনি? তাই বলো।

কেন, তুই পেয়েছিস নাকি? ব্রজেশ্বর শাণিত চোখে শিশিরকে বিদ্ধকরতে থাকেন।

এখনো পাইনি, তবে পাব পাব মনে হচ্ছে। শিশিরের হাসি রহস্যময়।

২

ব্রজেশ্বরবাবুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

"ওঃ এখনো পাসনি! পাব পাব মনে হচ্ছে! তবু ভালো! তবু রক্ষে!" ব্রজেশ্বর এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাসকে মুক্ত করে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন ঃ 'আরে, আমি তো বারো বচ্ছর ধরেই পাব পাব মনে করছি। মনে করায় আর পাওয়ায় ঢের দূর—ঢের ফারাক্। হুঁ!"

শিশির কোনো জবাব দেয় না, আপন মনে কী যেন ভাবে আর প্যাঁচ কষে।

লিলি বলেঃ "মামা, ও কথা থাক! আসামের জঙ্গলে তারপর কী হল বল। স্টেশন থেকে আসতে আসতে যতখানি বলেছ তারপর থেকে শুরু কর—"

'কদ্দূর বলেছি? পথে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলাম। সেই পর্যন্ত—না? আচ্ছা, তারপর থেকে বলি, শোন্।'

ব্রজেশ্বর পুনরায় নিজের পর্যটন কাহিনী শুরু করেন, নিজের মনে আর নিজের ভ্রমণে মশগুল হয়ে যান ঃ

'সেই ডাকাতরা তো? বেজায় বজ্জাত। ভারী ফিচেল—আর ভয়ানক নাছোড়বান্দা। আমি যতই বোঝাই, যতই আপত্তি করি কিছুতেই কান দ্যায় না। যতই বলি যে বনের পশুরাও ভূপর্যটক বলে খাতির করে আমাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, নরখাদকেরাও

আমার কেশ স্পর্শ করেনি, আর ডাকাত হয়ে, ভালো মানুষ হয়ে, তোমাদের এ কী কাণ্ড? এ কী রকম অভদ্র ব্যবহার? ততই ওরা বলে, আমরা তো আর চার পেয়ে জন্তু নই যে, পেয়ে তোমাকে অমনি ছেড়ে দেব। ওসব কথায় আমরা কর্ণপাত করিনা। আর নরখাদকদের কথা তুলছ যে, তোমাকে হজম করে —সাবড়ে দিয়ে আমাদের কী লাভ? খেতে আর এমনি কি তুমি খাসা হবে? তোমাকে খেয়েদেয়ে ছেড়ে দেব—এই যদি তুমি ভেবে থাকো—হুঁঃ! আমরা অতো বোকা নই। আর—তুমি তো একটা অখাদ্য!

আমি একটা অখাদ্য? শুনে আমার এমন দুঃখ হল! তুমি একটা আসামের ডাকাত—ডাকাতির আসামি—অধম পাপী তুমি কি বুঝবে? তোমাদের এলাকায় একলা পেয়ে, অসহায় পেয়ে, অখাদ্য বলে আমাকে খুব কষে অপমান করে নিচ্ছ। নাও, নাও, নিয়ে নাও, কী আর করছি! কিন্তু সে—সেই সামান্য নরখাদক—সেও তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, বহুগুণে উত্তম, আমি মুক্তকণ্ঠে বলব, —আমি নিজেই ভালো করে চেখে দেখেছি। আমি কতখানি সুখাদ্য—কতটা সুস্বাদু, সে কিন্তু আমাকে না চেখেই বুঝেছিল—দেখেই বুঝতে পেরেছিল। প্রথম দর্শনেই, প্রলুব্ধ হয়ে সে আমাকে তার হৃদয়ে হৃদয়ের চেয়েও চওড়া জায়গা তার উদরে আমাকে স্থান দিতে চেয়েছিল—তার অন্তরঙ্গ করতে চেয়েছিল আমায়!

তার কথা ভেবে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে যায়। জিভ দিয়ে একটু জলও যেন না পড়ে তা নয়। প্রথমে তার উপরে আমার রাগ হলেও, সত্যি প্রথমে তাকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—অতটা সমঝদার বলে ভাবতে পারিনি। একটু ভুলই বুঝেছিলাম তাকে। আমাকে উদরস্থ করার তার উৎসাহটা আমি খুব ভালো নিতে পারিনি গোড়ায়, —কিন্তু বেশিক্ষণ সে রাগ আমার ছিল না। তাকে মুখস্থ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার রাগ পড়ে গেছল—তাকে আত্মসাৎ করবার পরে আমার যা কিছু রাগ, জিভের জলের সঙ্গে এক হয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে অন্তর্গত করবার পর থেকে, আমার অন্তরের সমস্ত অনুরাগ এখন তার উপর গিয়ে চড়াও হয়ে পড়েছে। সে আর আমি এখন অভিন্নাত্মা, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না!

কিন্তু একজন সামান্য ডাকাত, যার কেবলমাত্র পরধনে লোভ—পরস্মৈপদী সম্পত্তির লালসা—মানুষের মূল্য—যথার্থ মূল্য সে কি বুঝবে? তার সাধ্য কী? একটা খুনে হলেও বরং বুঝতে পারত। চোর ডাকাতের কর্ম না! হ্যাঁ, ডাকাতের আবার খাদ্যাখাদ্য-বোধ!

যাকগে, যেতে দাও, পৃথিবীতে সবাই কিছু সব জিনিসের সমঝদার হয় না। 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ' বলেই দিয়েছে। সবার রুচি কিছু সমান নয়! অধম কি আর উত্তম হবে? ধমাধম উত্তম-মধ্যম দিলেও না। আর কথা বেশি না বাড়িয়ে, আমার যথাসর্বস্ব যা ছিল সব সেই ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে কেবলমাত্র কালাজ্বর সম্বল করে, কাঁপতে কাঁপতে, অবশেষে বর্মায় এসে পৌঁছলাম।

জ্বর গায়ে জর্জর অবস্থায় একজন ব্রহ্মদেশীয়ের বাড়ি অতিথি হলাম। লোকটি ভারী ভালো। না, না, সেরকম ভালো নয়—সেই নরখাদকের মতো ভালো সে কথা

বলছি না। সেরকম ভালো কিনা জানব কী করে? সবাই কি আর গায়ে পড়ে নিজেদের চাখতে দিচ্ছে? আর চাখতে দিলেও সে লোকটি যেরকম বুড়ো আর জরাজীর্ণ—তাতে সেই নরখাদকের মতো ভালো হবার তার সম্ভাবনা কম ছিল। সেরকম কচি নরখাদ্য খুব ক্বচিৎ মেলে!

তবু লোকটি ভালো। কেননা, আমি লোকটা ভালো কিনা, তার বাড়িতে পেয়েও—হাতেনাতে পেয়েও—জানবার চেষ্টা মাত্রও সে করেনি। করলে, সেই কাহিল অবস্থায়, আমি তাকে আটকাতে পারতাম কিনা সন্দেহ। বিনা বাক্যব্যয়ে অক্লেশে তার উদরসাৎ হয়ে যেতাম।

যা হোক, দিন কয়েক জ্বর-জড়িত থেকে কোনো গতিকে সেরে-সুরে তো উঠলাম—আর সেই লোকটি—সেই বুড়ো গৃহস্বামীটি—

ব্রজেশ্বরবাবু বলতে বলতে থেমে গেলেন।

লিলি বলে উঠল ঃ —কী হল তার? কী হল মামা?

কী আবার হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা!

কবিতা! সে আবার কী! শিশির জিজ্ঞেস করে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাকে ধরল। সেই লোকটা নিজেই শেষে রবীন্দ্রনাথের একখানা কবিতা হয়ে বসল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয়ে গেল সেই লোকটা? অ্যাঁ? শিশির লিলি ভয়ানক ধাঁধায় পড়ে যায়। সে আবার কি?

আমি সেরে উঠতে না উঠতেই, বুঝলি কিনা, —ব্রজেশ্বরবাবু এবার সঠিক ব্যাখ্যা করে সমস্তটা জলবত্তরেল করে দ্যান ঃ নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ পরে।

ওঃ, তাই বলো! তাকেও কালাজ্বরে ধরল! শিশির হাঁপ ছাড়ে। লিলিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

আর তুমি—তুমি বুঝি তাকে—লিলি সভয়ে দুচোখ বড়ো বড়ো করে তাকায়, ওর বেশি ও এগুতে পারে না।

দূর দূর। আমি কি আর তাই করি? লোকটার প্রতি তো আমার একটুও ভালোবাসা হয়নি যে—তবে—তবে কেন? ব্রজেশ্বরবাবু জবাবদিহি দ্যান ঃ লোকটার উপর আমার কেমন একটা বৈরাগ্য ধরেছিল।

তাই বোধহয় ও বেঁচে গেল? শিশির বলে। টিঁকে গেল এ যাত্রা?

উঁহু, বাঁচল না। মারাই পড়ল শেষটায়। মরবার সময় বলে গেল, মৌলমীনে তার একটা বাড়ি আছে, আর সেই বাড়ির মধ্যে একটা চোরা-কুঠরি রয়েছে, আর সেই চোরাকুঠরির মধ্যে—

অগাধ ধনরত্ন! শিশির নিশ্বাস ছাড়ে।

তুই কী করে জানলি? ব্রজেশ্বরবাবু রুখে ওঠেন ঃ কে বললে তোকে?

বলতে হয় না। এমনিতেই জানা যায়। অনেক অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে পড়া গেছে। এরকম ঢের পড়েচি আমি!

কই সে বই? সে সব বই কই দেখি?

সঙ্গে আনিনি তো। শিশির জবাব দ্যায়।

মাথা কিনেচ আমার! মামা আরো ক্ষেপে যান ঃ একটা যদি উপকার হয় কারুর দ্বারা। কথায় বলে যম জামাই ভাগনে, তিন না হয় আপনে! এই তিন মূর্তি কক্ষনো আপনার হয় না। কথাটা দেখচি ঠিক।

বাঃ আমি কী করে জানব যে সে বই তোমার কাজে লাগবে? শিশিরও একটু খাপ্পা হয় ঃ তুমি কি আনতে বলেছিলে?

না বললে কি আনতে নেই? ভাগনে তবে আর বলেচে কেন?

লিলি মাঝখানে পড়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেয় ঃ আচ্ছা, আমি মাকে লিখে দেব'খন? মা ভি-পি করে পাঠিয়ে দেবে।

মামা এতক্ষণে একটু আশ্বস্ত হন ঃ হ্যাঁ, লিখে দিস। যেন ফেরত ডাকেই পাঠায়। ভি-পি করে নয়, রেজেস্টারি করে পাঠায় যেন। এমন জরুরি দরকার যে কী বলব! যদি সেই সব বইয়ের ভেতরে কোনোরকমে ফন্দিফিকির বাতলানো থাকে, হদিশ-টদিশ থেকে যায় কোনো। হ্যাঁ, তারপর, কী বলছিলাম! সেই বর্মী বুড়োটা! মরবার সময় মৌলমীনের সেই বাড়িটা আমাকে দিয়ে গেল। আর বলে গেল, দিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তুমি কখনো সে বাড়িতে থেকো না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম ঃ কেন, সে বাড়িতে কী হয়েছে?

সে বললে ঃ কেন, বুঝতে পাচ্ছ না? কোথায় আমি এই উত্তর ব্রহ্মে, আর কোথায় সেই সুদূর দক্ষিণে, সমুদ্রের ধারে মৌলমীন! মৌলমীন শহর ছেড়ে, সেই রাজার অট্টালিকা পরিত্যাগ করে কেন এখানে এসে, এই হিমালয়ের পাদদেশে, এমন কষ্টেসৃষ্টে বসবাস করছি! তাই থেকেই কি বুঝতে পারছ না?

আমি বললুম ঃ উঁহু! কিসসু না!

বুড়ো বললে ঃ সে বাড়ি! সে বাড়ি—ভারী ভয়ানক। আর তারপরেই সে খাবি খেতে শুরু করল।

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম ঃ তা তোমার সেই চোরাকুঠির সন্ধান পাব কী করে? তার কি কোনো নকশা টকশা নেই? আছে? কোথায় সেই নকশা? বলো, বলো, বলে যাও। অমন করে খাবি খেয়ো না। ওইভাবে চলে যেয়ো না; ছলনা করে চলে যেয়ো না। আমি বারংবার আবেদন করি, নিবেদন করি—সকাতর প্রার্থনা করি—তার অন্তিম দরবারে আমার ব্যাকুল আর্জি জানাই, আর সে ঘাড় নাড়ে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে। কিন্তু তার বেশি আর কিছুই তার সেই হাঁ-করা মুখ দিয়ে বার হয় না—হাঁ-ও না, হুঁও না।

শিশির বলল ঃ এমনিই হয়! ঠিক এই রকমটাই হয়ে থাকে—কী বলিস লিলি? ঠিক এই ধরণাটাই হয় কিনা?

হ্যাঁ, দাদা! লিলি তার ছোটো ঘাড়খানা নেড়ে সায় দ্যায়। সব বইয়েই ঠিক এই রকম।

তবে আমি জানি, আমি জানি বটে, কোথায় তোমার সেই নকশা আছে। শিশির ব্রজেশ্বরবাবুর দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করে ঃ বুড়ো না বললেও, আমি তোমায় বলে দিতে পারি। বলে দেয়া কেন, আমি বার করেই দিচ্ছি যা হয়! এসো আমার সঙ্গে। এখনই বার করে দিচ্ছি।

৩
কেঁচো খুঁড়তে সাপ

শিশির যায় আগে আগে, সাথে সাথে লিলি। পেছনে পেছনে ব্রজেশ্বর।

ব্রজেশ্বরের মুখে অবিশ্বাসের হাসি!

আশ্চর্য নয়! দীর্ঘ বারো বছরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হলে বড়ো বড়ো বিশ্বাসই টলে যায়। বারো বছর ধরে চেষ্টা-চরিত্র করে, বাড়াবাড়ি করেও, এমনকী, ভগবানের যদি দেখা না মেলে—তাঁর টিকিরও সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে বড়ো বড়ো, বিরাট বিরাট, ভক্তও নাস্তিক্যবাদী হয়ে পড়ে। অগাধ ধনরত্ন তো তুচ্ছ, ব্রজেশ্বর তো কোন্ ছার!

শিশির জিজ্ঞেস করে ঃ নকশাটা কোথায় রয়েছে, টের পেয়েছিস লিলি?

না তো! লিলি ঘাড় নাড়ে।

এত বই পড়া সব তোর ব্যর্থ হয়েছে দেখছি। বাজেই অ্যাদ্দিন অ্যাডভেঞ্চারের বই তোকে পড়ালুম। কিচ্ছু লেখাপড়া হয়নি তোর। এখনো মানুষ হতে পারিসনি। শিশির মুখখানা মুরুব্বির মতো বানায় ঃ 'মেয়েই রয়ে গেছিস। আস্ত একটা মেয়ে!'

কথাগুলো ঠিক মোরব্বার মতো নয়, লিলি মুখ কাচুমাচু করে থাকে। প্রতিবাদের একটা চেষ্টা করে ঃ বারে, আমি কী করে জানব। আমি কি হাত-গুনতে জানি?

আমার যদি একটা টাইগার থাকত, সেও যে বলে দিতে পারত রে! শিশিরের অসন্তোষ সীমান্ত ছাড়িয়ে যায়।

আমার থাকলে সেও বলতে পারত। লিলিরও এবার একটু ধোঁয়া বেরয় ঃ টাইগাররাই তো পারে। ওদেরই তো এই কাজ! ওরাই পারবে তো। ওতো মানুষের কর্ম নয়। কিন্তু—কিন্তু—তার আশঙ্কাটা ব্যক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা ভেবে লিলি একটু ইতস্তত করে ঃ কিন্তু টাইগার আর আমি পাচ্ছি কোথায়? তুমি তো আর টাইগার হতে পারবে না। অন্তত এ জন্মে তো আর পারছ না!

এ জন্মেই পারব। পারব না, কে বলেছে—কে? শিশির গরম হয়ে ওঠে।

অনেকেই বলে! তা বলে আর পারতে হয় না? লিলিও টগবগ করতে থাকে ঃ ঘেউ ঘেউ করা সহজ, টাইগার হওয়া অত সহজ না!

এক্ষুনি পারব! চক্ষের পলকে দেখিয়ে দিচ্ছি। শিশির সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে ঃ দেখতে না দেখতেই দেখতে পাবি।

এই বলে, শিশির, সিঁড়ির সেই জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেইখানে যেখানে সে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল একটু আগেই।

শিশির জায়গাটার আগাপাশতলা পা চালিয়ে, টিপে টিপে দ্যাখে। কিছু না। তারপর, সহসা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে, একজন উঁচু দরের নাচিয়ের মতো দাপাদাপি লাগিয়ে দ্যায়! দেখতে না দেখতেই আবার ধরণী দ্বিধান্বিত হয়েছে, এবং সেই দ্বিধার অবকাশে, সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে, শিশিরের একখানা শ্রীচরণ গলে চলে গেছে।

এই যে! এই যে পেয়েছি! পেয়ে গেছি! কেল্লা মেরে দিয়েছি। শিশির চিৎকার করে ওঠে।

ব্রজেশ্বর অবিশ্বাসে আর সন্দেহে, বিস্ময়ে আর বিরক্তিতে এতক্ষণ ওতপ্রোত হচ্ছিলেন, এবার তিনিও আর্তনাদ করে উঠলেন।

ভাঙলি! ভাঙলি তো সিঁড়িটা! আমি তখনই জানি। এই তোমার নকশা বার করা?

কিন্তু বলতে না বলতে, শিশির, পায়ের সঙ্গে একখানা হাত গলিয়ে দিয়েছে, এবং হাতড়ে-মাতড়ে, তার অন্তস্তল থেকে, রুলের মতো করে পাকানো কাগজের কী একটা গুলতানি টেনেও বার করেছে।

কাগজটার ভাঁজ খুলে ফেলতেই—বেরিয়ে পড়ল পুরোনো এক পার্চমেন্ট আর তার পিঠে কী সব মন্ত্র করা।

এই তো সেই নকশা। শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ঃ সেই নকশাই তো।

শিশিরের মামা সিঁড়ির মাথায় বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কী যেন একটা স্বপ্ন

দেখছিলেন, এইবার তিনি একলাফে, একটি মাত্র উল্লফনে সব কটা সিঁড়ি এক নিমেষে টপকে এসে শিশিরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দে—দে! আমার নকশা দে! বলতে না বলতে পার্চমেন্টটা তিনি শিশিরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন।

বাঃ, আবিষ্কার করলাম, আর তোমার নকশা কী রকম? শিশির ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে বলতে গেছে।

তোর নকশা! ভারী ইয়ার হয়েছেন! এই বলে ব্রজেশ্বরবাবু ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছেন শিশিরের গালে ঃ বারো বছর ধরে আমি-ব্যাটা হাতড়ে মরছি, আর ওঁর কিনা নকশা হল! আবদার আর কি!

এই বলে তিনি আর অযথা বাক্যব্যয় না করে অতিরিক্ত চড়-চাপড়ের প্রলোভন পর্যন্ত সম্বরণ করে দৌড়তে দৌড়তে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে খিল এঁটে দিয়ে নকশার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।

খুব লেগেছে নাকি দাদা? লিলির আবার শিশিরের প্রতি সহানুভূতি দেখা যায়।

শিশির কিছু না বলে আহত গালে হাত বুলোয়।

এ কী রকম মামা আমাদের? লিলি অবাক হয়। বাবাঃ, কী বদরাগী।

মামারা এই রকমই। শিশিরের আপন মনে সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস।

আচ্ছা, মামা হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেল কেন দাদা?

লিলি দাদার গালে হাত বুলোতে পারে না, ইচ্ছা থাকলেও পেরে ওঠে না, একটু আগেই ওদের মধ্যে যে বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেছে সেই কথা মনে করেই ওর হাত ওঠে না। ভয় করে, তাহলে হয়তো শিশিরের হাত উঠে আসবে। নিজের গাল থেকে লিলির গালেই এসে পড়তে পারে চাই কি।

অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যাম্! শিশির উদাসীনের মতো জবাব দ্যায়। তার মুখপত্রে দার্শনিকতার বিজ্ঞাপন।

এ রকম হবে আমি ভাবতেও পারিনি। লিলির কণ্ঠে সহানুভূতির সুর।

আমি ভাবতে পেরেছিলাম। শিশিরের গলায় নির্লিপ্তির স্বর। এই রকমটাই হয়। এই রকমই হয়ে থাকে! অনেক দিন আগেই আমি এ সব ভেবে দেখেছি। শিশিরের ললাটে ভুয়োদর্শনের প্রচ্ছদপট!

থাক গে! যেতে দে। মামা তো খিল এঁটেছে। চোরাকুঠরির হদিশ না নিয়ে আর নড়ছেন না। চল এই ফাঁকে আমরা বেরিয়ে পড়ি মৌলমীন শহরটা বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখে নিই ততক্ষণ!

বেড়াতে বেড়াতে দুজনে সমুদ্রের ধারে চলে যায়। শিশির ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে ঃ মামা কী রকম চালাক দেখলি? দেখলি তো লিলি?

মামার মূঢ়তা দেখেছে, রূঢ়তাও দেখা গেছে, মামা যে 'লাকী' সে বিষয়েও ভুল নেই, অযাচিত অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ির নষ্ট-কোষ্ঠী পুনরুদ্ধারেই সেটা প্রত্যক্ষ হয়েছে, কিন্তু মামার চালাকি যে কোন্‌খানে লিলি সেটা সহজে বুঝে উঠতে পারে না।

আমাদের শিলং থেকে, অত লং ডিস্ট্যান্স থেকে ধরে বেঁধে ডেকে আনানোর কী মানে, বুঝতে পারলি নে?'

না তো!

এই জন্যেই! চালাকি করে নকশাটা উদ্ধার করে নেবার জন্যেই! আমাকে ছাড়া আর কারু দ্বারা হত না কিনা! শিশির দুঃখের সহিত এবং একটু গর্বের সঙ্গেই বিবৃতি দ্যায়।

এ ছাড়া তাদের আনানোর আর কী কারণ থাকতে পারে, শিশির ধারণা করতে পারে না। কোথায় শিলং আর কোথায় মৌলমীন—কতখানি ফারাক! এবং যে মামা বারো বছর আগে তাদের মায়া কাটিয়ে চলে এসেছেন, সে সময় তারা দু-তিন বছরের, সেই সময়েই যা কোলে পিঠে করে মানুষ করে—বা মানুষ করবার বৃথা চেষ্টা করে অবশেষে (দুশ্চেষ্টায় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েই কিনা কে জানে) তাদের পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন, এমনও হতে পারে যে তারাই মামার বৈরাগ্যের কারণ; — মামার আকস্মিক বানপ্রস্থের, পরদেশ-আসক্তির, দেশান্তর-বিলাসিতার মূলে খুব সম্ভব তারাই; মামা হয়তো ভেবেছিলেন, এই শিশুদের, যারা কখনও নায়েগ্রা আর কখনও গন্ধমাদন তার কিছুই স্থিরতা নেই—কখন প্রপাত আর কখন বা উৎপাত বলা কঠিন, কখন যে খাদ্য (কেবল চুমুর দিক দিয়ে) আর কখন অখাদ্য কে বলবে, তখন যাবতীয়

লাভ ক্ষতি খতিয়ে, তিনি ভেবে দেখলেন, এদের কোলে পিঠে করার চেয়ে সমস্ত ভূভার ধারণ করাও সহজ, (এবং ঢের বেশি নিরাপদ,)—এর চেয়ে, এই পরস্মৈপদী নন্দন কানন বহনের চেয়ে, কস্তুরী মৃগসম নিজের গন্ধে উন্মাদ হয়ে, বনে বনে, অরণ্যে অরণ্যে, সারা ধরিত্রীময় ছুটোছুটি করে বেড়ানোও ঢের ভালো—ঢের ঢের সুখের! সেই বিরাগী মামার হঠাৎ যে আবার এত অনুরাগ উথলে উঠবে এমন মন-কেমন করতে লাগবে যে, তাদের দেখবার লালসায়, মার কাছে তার করে সামার ভ্যাকেশনেই আমদানি করার জন্যে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন, এরকম সম্ভাবনার ভাবনাই করা যায় না। শিশির, ব্রজেশ্বরবাবুর মতলবটা, মনোগত অভিপ্রায়টা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চুলচিরে লিলির কাছে পরিষ্কার করে দ্যায়। সমুদয় রহস্য সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো বেবাক ফাঁক হয়ে যায়।

তাই তো! তাই তো বটে। লিলিও আর ভিন্নমত পোষণ করতে পারে না।

আমি অবশ্যি প্রথমে অন্য কথা ভেবেছিলাম—বলতে বলতে চেপে যায় শিশির।

কী? কী কথা?

না, বলব না। বললে তুই ভয় খাবি। শিশির বলে।

না, বলো না? ভয় কীসের? লিলি রীতিমতো নির্ভীক।

আমি ভেবেছিলাম—মামার গল্প শুনতে শুনতেই মনে হয়েছিল আমার। মামা সেই যখন বলল না যে, সেই নরখাদকটার তার এখনো তাঁর মুখে লেগে রয়েছে—বলল না?

বলল তো! তার কী?

সেই ভুক্তভোগী নরখাদকটা মামার পেটে গিয়ে যে এখন বসবাস করছে!

করছেই তো! কী হয়েছে তার?

সে আর এখনো আছে কি? কবে হজম হয়ে গেছে। তাই মামা হয়তো তার শূন্যস্থান পূরণ করবার জন্যে, তার অভাব মোচনের অভিলাষেই, হয়তো—হয়তো—

হয়তো আমাদের—? অ্যাঁ? লিলির দু-চোখ ভয়ে যে ভুরুর পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়তে চায়

হ্যাঁ, তাই! মামা বলল কিনা যে লোকটার তার এখনো তাঁর মুখে লেগে রয়েছে। বলেই সুড়ুৎ করে মুখের ঝোল টেনে নিল, আর জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিল—দেখলি না?

আর কেমন একটা অদ্ভুত চোখে আমাদের দিকে তাকাল! লিলি কম্পিত কণ্ঠে বলে: দেখেছি বই কি।

তবু তো সে লোকটা খাসিই ছিল। ধেড়ে একটা খাসি ছাড়া আর কী? আমাদের মতো কচি পাঁঠা পেলে—?

বাকিটা, বাকি অনির্বচনীয়ত্ব, শিশির অব্যক্তই রেখে দ্যায়। তাহলে চলো পালাই এখান থেকে। পরের ট্রেনেই পালিয়ে যাই। সোজা একেবারে রেঙ্গুনে—সেখান থেকে ফিরতি জাহাজে লম্বা এক পাড়ি। লিলি লীলায়িত হয়।

উঁহু, যখন এসেছি, তখন শেষ পর্যন্ত না দেখেই যাবে? গুপ্তধনের কিনারা না করেই? পাগল? তাছাড়া, খেলেই অমনি হল কিনা! খাওয়া পথেই পড়ে আছে আর কি? হুঁ! আমরা হুঁশিয়ার থাকব না? তাছাড়া, আরেকটা কথা—

কী? কী কথা? আরো কী আশ্চর্য কথা শিশিরের আশ্চর্যতার মাথা থেকে বেরিয়ে আসে, লিলি সেজন্য উৎকর্ণ হয়!

মামা বলল না, বলল না যে, ভয়ানক ভালোবাসা না হলে চাখবার কথা মনেই জাগে না। যেমন সেই বর্মিটার উপর মামার তেমন ভালোবাসা হয়নি বলে—কেমন যেন একটু বৈরাগ্য হয়েছিল বলে—তাকে মুখে তোলবার কথা মামার মনেই হয়নি।

তুমি বলছ যে মামা আমাদের তত ভালোবাসে না? অন্তত তত ভয়ানকভাবে নয়? তাই তেমন ভয় নেই বলছ?

ভালো যা বাসে তাতো এক চড়েই বুঝেছি! এই বলে শিশির আবার নিজের গালে আরেকবার হাত বুলিয়ে নেয়। উঃ, যা জ্বলছি!

এতক্ষণে লিলি তবু কিছু ভরসা পায়। অমন কঠোর-হৃদয় মামার ভালোবাসার পাত্র হওয়া সহজ নয়, সে কথা সত্যি। এবং ভালোই যদি না বাসেন, তাহলে, কেন আর মামা, অত কষ্ট করে তাঁর হৃদয়ের চেয়েও চওড়া জায়গায়, তাঁর উদার উদরের পরিধির মধ্যে অন্যান্য খাদ্যাখাদ্যদের হটিয়ে, উপাদেয় চর্ব-চুষ্যদের বাদ দিয়ে তাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান করতে উদ্ব্যস্ত হবেন?

তাই ভালো! যদি কেবল চড়ের উপর দিয়েই যায়, সেও মঙ্গল! লিলি বলে ঃ চর্চড়ি না হতে হলেই হলো।

৪
প্যারাসুট-বাহিনী

দ্যাখ, দ্যাখ! চেয়ে দ্যাখ! নৈঋৎ কোণ থেকে কী একখানা আসছে তাকিয়ে দ্যাখ। আকাশের দিকে লিলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিশির।

একখানা এরোপ্লেন। লিলির বুঝতে দেরি হয় না। সমুদ্রের উপর দিয়ে আসছে।

এরোপ্লেন তো বটেই, কিন্তু নৈঋৎ, কোণ থেকে উঁকি মারছে কি না, দেখছিস নে? সেইটাই ভাবনার কথা।

ওটা নৈঋৎ কোণ না কি? নৈঋৎ কোণ, কোন কোণ, দাদা?

কে জানে! তবে খারাপ যা কিছু সব ওই কোণ দিয়েই আসে। ঝড় ঝাপটা সাইক্লোন—সব! এরোপ্লেনও কি কম মারাত্মক আজকাল? সাইক্লোনের চেয়ে কিছু কম কি? আমাদের উপর বোমাই ফেলবে কী না কে বলতে পারে?

কিন্তু ওটাই যে নৈঋৎ কোণ তা তো আর তুমি ঠিক জানো না।

জানি না মানে? হতে বাধ্য। মারাত্মক যা কিছু মন্দ যা কিছু আর কোন দিকে দিয়ে আসবে শুনি? তারা কেবল ওই এক কোণঠাসা হয়ে রয়েচে। নৈঋৎ কোণ।

ওটা যে বদ মতলবে আসচে কী করে তুমি বুঝলে?

ওর চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি। ওর চালচলন দেখেই। ওর হাবভাবেই ধরা পড়ছে। সমস্ত এই দূর থেকে দেখেই টের পেয়েছি। আমার দূর-দর্শন আছে এটা তো তুই মানিস? না হলে সেই নকশাটা বার করলুম কী করে?

এ-কথার পর আর কোনো কথা চলে না। লিলি চুপ করে যায়। ভূয়োদর্শী লোকেরাই দূরদর্শী হয়ে থাকে, কে না জানে? যারা দূরের জিনিস দেখতে পায়, তারা ভূয়োও অনেক কিছু যে দ্যাখে, এ কথাই বা কে অস্বীকার করবে? মনে মনে এই সব খুঁটিয়ে খতিয়ে, লিলি বেশী আর উচ্চবাচ্য করে না। এরোপ্লেনের রীতি এবং কোণের নৈঋতি যখন তার দাদার কাছে প্রাঞ্জল, জলের মতই প্রাঞ্জল, তখন, একবাক্যে তার নিজের কাছেও পরিষ্কার —খুব ধবধবে পরিষ্কার না হলেও—মেনে নেবার মতো মানানসই হতে বাধা কী?

দ্যাখ দ্যাখ, এরোপ্লেনটা কিরকম ডিগবাজি খাচ্ছে—দ্যাখ লিলি।

ঘুড়ির মতোন অমন লাট খাচ্ছে কেন দাদা? লিলিও জিজ্ঞেস করে।

মতলবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তো! লাট খেতে খেতে বেটপকা সমুদ্রে না পড়ে যায়। তাহলেই—তাহলেই— অবরুদ্ধ নিশ্বাসে শিশিরের কণ্ঠরোধ হয়।

তাহলে কী হবে?

কী আবার হবে! সলিল-সমাধি! যা হয়ে থাকে।

শিশির মহাপুরুষ না হলেও, বয়ঃক্রমের অবিচারে এখনও না হতে পারলেও, মহাবালক তাকে বলতেই হয়। কেন না সে কেবল দূরদর্শীই নয়, বেশ একটু বাকসিদ্ধও বই কি! বলত না বলতে, এরোপ্লেনটা ওলটাতে পালটাতে, একেবারে সমুদ্রের বুকের উপর এসে খাবি খায়। কিন্তু তার আগেই—

তার আগেই তার চালক, একমাত্র আরোহীই খুব সম্ভব এরোপ্লেন গলে প্যারাসুট বগলে, ফাঁকা হাওয়ায় পদার্পণ করেচে। সুবিস্তৃত ছত্রাকার বস্তুটি অবলম্বনে শূন্যমার্গে ঝুলে পড়েচে!

আকাশ বিদীর্ণ করে আস্তে আস্তে নামতে থাকে সে!

শিশির সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

প্যারাসুট-বাহিনী! তার মুখ থেকে খালি বেরোয়।

প্যারাসুট-বাহিনী বলচ কি দাদা? ভাষার এবম্বিধ লাঞ্ছনায় লিলি মৃদু আপত্তি না জানিয়ে পারে না: শুধু একজন তো লোক! প্যারাসুটবাহী বলতে পার বরং।

লোকটা মেয়ে কী পুরুষ এতদূর থেকে দেখতে পাচ্ছি নাকি? দূরদর্শী হয়েও নিজের দুর্বলতা স্বীকার করতে শিশিরের লজ্জা হয় না: আর মেয়ে হলে বাহিনীই তো হবে, ব্যাকরণেই বলে দিয়েচে। যেমন সিংহবাহিনী? সিংহবাহিনী বলতে কী বোঝায়? একগাদা সিংহ কী? মোটেই না? সিংহবাহিনী মানে মা দুর্গা! তার মানে—উদাহরণ দিয়ে বিশদ করে ব্যাখ্যা দ্বারা সে বিস্তৃত করে: তার মানে মেয়েরা একাই একশো কিনা। একাই একটা বাহিনী!

তোমার মাথা! লিলি, নিজে মেয়ে হলেও, এতখানি নির্জলা প্রশংসা, আত্মপ্রশংসা, বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়।

এই যা, লোকটাও যে জলে পড়ল দেখছি। ভেবেছিলাম, উড়তে উড়তে ডাঙায় এসে পৌঁছবে।

ডুবে গেল যে লোকটা! লিলির অস্ফুট আর্তনাদ।

এখানে তো আর কেউ নেই! কী মুশকিল দ্যাখো তো! শিশির ভারী বিব্রত হয়ে পড়ে ঃ আমাকেই গিয়ে বাঁচাতে হবে দেখছি।

তুমি? না না—তুমি না! লিলির স্বরে আবেগ। না দাদা! সকাতর আবেদন!

কেন আমি সাঁতার জানিনে? ডুবন্ত লোককে বাঁচাতে পারিনে নাকি আমি।

সমুদ্রে কখনো সাঁতার কাট নি তো!

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?' লিলির জবাবে এই কথাটা বলতে গিয়ে শিশির থেমে যায়। উপমাটা ঠিক তার উপযুক্ত নয়—বীরত্বব্যঞ্জকও না—যথোচিত নয় তার পক্ষে। একটু ভেবে নিয়ে সে বলে ঃ কেন, যে খাতায় অঙ্ক কষে, সে কি ব্ল্যাকবোর্ডে কষতে পারে না?

এই বলে শিশির মালকোচা মেরে তৈরি হয়ে নেয় ঃ লোকটাকে কেমন করে অবলীলাক্রমে উদ্ধার করে নিয়ে আসি, তুই চেয়ে চেয়ে দ্যাখ।

শিশির সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লিলি চিৎকার করে বাধা দিতে যায়, কিন্তু তার আওয়াজ বেরোয় না। সমুদ্রের

বুকে শিশির-সম্পাত, — কাঠের পুতুলের মতো সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে। তার দু চোখের উপকূল আরেক লোনাজলে ছাপিয়ে উঠে।

শিশির সাঁতারে কোনোরকমে মজ্জমানের কাছাকাছি যেতেই, তাকে হস্তগত করবার আগেই, লোকটিই শিশিরকে পাকড়ে ফ্যালে।

এ কী! তুমি আবার কে হে? তুমি এখানে কেন? পরিষ্কার বাংলাতেই প্রশ্ন করে সে। এবং দেখা যায় প্যারাসুট বাহিনী নয়, লোকটা প্যারাসুট বাহন।

তোমাকে বাঁচাতে এলাম। শিশির বলে ঃ তুমি ডুবে যাচ্ছ।

আমাকে! আমাকে বাঁচাতে! লোকটি না হেসে পারে না। কী সর্বনাশ!

এক কাজ করো। আমার কাঁধ আঁকড়ে পিঠের সঙ্গে লেপ্টে থাকো এই বলে সেই লোক, ডুবন্তরা যেমন করে খড়কুটো পাকড়ায়, ঠিক তেমনি করে শিশিরকে ধরে নিজের পিঠে জড়িয়ে নেয়—যেমন করে স্নানযাত্রীরা গামছা কাঁধে ফ্যালে আর কি।

উদ্ধার করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে শিশির নিজেই উদ্ধৃত হয়ে পড়ে।

শিশিরকে পৃষ্ঠসাৎ করে লোকটা যদৃচ্ছ সাঁতার কেটে তটভূমির দিকে এগুতে থাকে।

ঢেউয়ের কীরকম জোর দেখচ! আর কী ভীষণ আন্ডারকারেন্ট! আমি না থাকলে এতক্ষণ তলিয়ে কোথায় ভেসে যেতে। লোকটি, শিশিরের বোঝা ঘাড়ে ফেলেই শিশিরকে বোঝাতে চায়।

শিশির কিন্তু ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের কোনো কারণ খুঁজে পায় না। কৃতজ্ঞতারও কোনো বিজ্ঞাপনও দ্যায় না।

ডাঙায় দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে, ওই মেয়েটি কে?

আমার বোন। শিশিরের কাটা জবাব।

ও আবার তোমাকে উদ্ধার করতে ছুটে আসবে না তো? কিংবা আমাকেই হয়তো? তাহলেই তো আমি গেছি। আমার তো একটি মাত্র পিঠ। —লোকটি বলে।

একমাত্র পিঠ তো কী হয়েচে?

শিশির উসকে ওঠে, তার একটু উষ্মাই হয়। লোকটা নিজের পীঠস্থানের মাহাত্ম্য নিয়ে যেরকম বাড়াবাড়ি লাগিয়েচে, তাতে ওর পৃষ্ঠপোষকতার চেয়ে সলিলসমাধিও শ্রেয়—ঢের শ্রেয় বলে শিশিরের ধারণা হতে থাকে। পৃষ্ঠে ধারণ করে লোকটা যেন ওর মাথা কিনতে চায়। কে ওকে অমন করে পিঠে ধরতে বলেছিল?

একটি তো পিঠ, তাই নিয়ে আমি কজনের দ্বারা উদ্ধার হব? তাও আবার তুমিই এখন গ্রাস করেচ। পরহস্তগত পিঠ নিয়ে কজনের দ্বারা উদ্ধার হওয়া যায়? তুমিই বলো?

কে আবার তোমাকে উদ্ধার করতে আসচে? শিশির জান[illegible] চায়।

বলা যায় না তো, ওই মেয়েটাও আসে যদি? তোমার যখন বোন, পরের জন্য পরের প্রাণদানের জন্য নিজের প্রাণ দেবার বাতিক ওরও থাকতে পারে, বিচিত্র কি?

তাহলে বাপু, আমি পারব না, পেরে উঠব না। তোমার নিজের পিঠেই ওকে স্থান দিতে হবে তাহলে। আগে থেকেই আমি বলে রাখছি কিন্তু।

শিশির কিছু বলে না, চটেমটে চুপ করে থাকে। উপকার করতে এসে উপকৃত হলে, বড়ো বড়ো বীররাই বিরক্ত হয়ে যায়—শিশিরেরও বিরক্তি ধরবে সে আর বেশি কী?

আস্তে আস্তে ওরা উপকূলে পৌঁছায়—ডাঙায় এসে পরস্পরকে নামায়।

উঃ! লোকটা কপালের ঘর্মাক্ত জল মুছে ফ্যালে ঃ এই তোড় ভেঙে আর ঢেউ ঠেলে একটা লোককে টেনে নিয়ে আসা কি সোজা? প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যায়! বাপ! লোকটি হাঁপ ছাড়ে ঃ মানে তোমার দাদার কথাই বলচি! আমাকে উদ্ধার করতে বেচারি হিমসিম খেয়ে গ্যাছে।

আমার দাদা ওই রকম! দাদার গর্বে ও গৌরবে লিলি টইটম্বুর ঃ পরের প্রাণদান করতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়ে ফ্যালে। কতবার!

"তাই তো দেখচি। এরকম দাদা নিয়ে ঘোরাফেরা নিরাপদ নয়।"

"নয়ই তো! আরেকটু হলে আমি নিজেই তো জলে পড়েছিলাম! যদিও সাঁতার জানিনে তবু দাদার প্রাণ বাঁচাতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হত!"

উঃ, বড্ড বেঁচে গেছি দেখছি! লোকটি অনেকখানি নিশ্বাস ফেলে দ্যায় ঃ মানে তুমিই বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছ আজ।

কথা কইতে কইতে তিনজনে শহরের মধ্যে এগুতে থাকে। শিশির খুব কমই কথা বলে। কী করে এরোপ্লেনের কল বেগড়াল, 'কব্জাগুলোকে কিছুতেই আর কায়দায় আনা গেল না, সবসমেত সমুদ্রগর্ভে তলাবার আগে কোন সতর্ক মুহূর্তে, মাথা এবং প্যারাসুট খেলিয়ে অধোগামী এরোপ্লেনের কবল থেকে, সবলে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে, শূন্যমার্গে নিরুদ্দেশেই, নিজেকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছেন—এই সব কথা। কোথা থেকে আসছেন, কোনখানেই বা গন্তব্য, এবং কেনই বা নৈঋৎ কোণকে এভাবে অগ্রাহ্য করে তাঁর এই সব অভ্রভেদী পঞ্জিকা-বিরুদ্ধ যাতায়াত—তার কোনো কথাই কিন্তু ভদ্রলোক পাড়তে দিচ্ছিলেন না।

লিলি উচ্চবাচ্য করে, শিশিরও উসখুস করতে থাকে—কিন্তু যেভাবেই শুরু হোক না কেন, প্রশ্নপত্র চেপে যাবার ভদ্রলোকের অদ্ভুত ক্ষমতা।

অবশেষে তারা বেড়াতে বেড়াতে শহরের বড়ো একটা বাড়ির পাশে এসে পড়ল। বাড়িটার গায়ে, সচিত্র এক বিজ্ঞাপনে, দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবার একটা ঘোষণা জ্বলজ্বল করছিল।

শিশির না দেখেই বলল ঃ —ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল। বুঝেচি!

লিলি এগিয়ে যায় ঃ কই দেখি!

ও দেখে কী হবে? কেউ সল্‌ভ করতে পারে না। পারতে গেলে, সহজ কথার জায়গায় শক্ত কথা, শক্ত কথার জায়গায় সহজ কথা হয়ে যায়—যা করবি ঠিক তার উল্টোটা হবে। তার মানে, উল্টোটাই হচ্ছে ঠিক। বুদ্ধি খাটিয়ে ফের যদি তার উল্টো

করতে যাস দেখবি আবার তার উল্টো হয়ে গেছে। এন্ট্রি-ফিই মাটি, অনেক টাকা গেছে আমার। শিশিরের কাছে স্পষ্ট কথা—শিশির ওসব দিকে ভুলেও আর ভ্রুক্ষেপও করবে না। অভিজ্ঞতাবান উদাসীন শিশির।

ভদ্রলোক কিন্তু একবার চোখ বুলিয়েই বিজ্ঞাপনটা আড়াল করে দাঁড়ান ঃ হ্যাঁ! এসব পুরস্কার কেবল ঘোষণা করাই সার! কেই বা পাচ্ছে, আর কেই বা নিতে যাচ্ছে! কাউকে পেতে দিলে তো!

এই বলে ওদের সাথে হনহন করে, আরেকটু এগিয়ে, চৌমাথায় পৌঁছেই, চলতি একখানা ট্যাক্সি থামিয়ে তিনি চট করে উঠে পড়েন—এবং ওদের আর একটি কথাও না বলে তিরবেগে তিরোহিত হয়ে যান। লোকটার আকস্মিক অন্তর্ধানে শিশির একটু বিস্মিতই হয়।

চলো না দাদা, দেখে আসি পাজ্‌লটা। পারা যায় কিনা দেখা যাক। বর্মার ক্রসওয়ার্ড হয়তো অত শক্ত হবে না।

তোর ভারী টাকার লোভ! পাবি নে, তবুও। বলছি নে, আমার অনেক টাকা ওরা মেরে দিয়েছে। ওই ক্রসওয়ার্ডরা।

শিশির আর লিলি আবার সেই বাড়িটার পাশে ফিরে আসে। আরো, এ বাড়িটা তো শহরের একটা থানা বলে বোধ হচ্ছে? হ্যাঁ, থানাই তো! ইতস্তত লালপাগড়ি দেখা যায় যে। কিন্তু, এ আবার কিরকম ক্রসওয়ার্ড।

বিজ্ঞাপনের গায়ে ইংরেজি ভাষায় লেখা ঃ নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার। হংকং-এর জেল হইতে কিছুদিন পূর্বে পলাতক দুর্ধর্ষ বাঙালি দস্যু—বক্কেশ্বর আইচ—যে কেহ ইহাকে ধরাইয়া দিলে বা সঠিক সন্ধান দিতে পারিলে, উক্ত পুরস্কার লাভ করিবেন।

তবে, ক্রসওয়ার্ড না হলেও পাজল যে সে বিষয়ে ভুল কী?

সেই বিজ্ঞাপনের অঙ্গে যে ফোটো লাগানো, সেই ফোটোর সঙ্গে—সমুদ্রগর্ভ থেকে সদ্যোত্থিত ওই ভদ্রলোকের ভয়ঙ্কর মিল। বেধড়ক মিল, যাকে বলে।...

৫
অবাঞ্ছনীয় আগন্তুক

বাড়ি ফেরার পথে শিশির চুইংগাম কেনে। গোটাকতক নিজের এবং লিলির মুখে অর্পণ করে বাকিগুলো রেখে দ্যায়।

মামার পায়ে লাগানো যাবে এগুলো—শিশির বলে।

মুখের বদলে পায়ে কেন, লিলি ভেবে পায় না। কেন, পায়ে কেন? মুখ থাকতে—পায়ে? সে জিজ্ঞেস করে।

আন্দাজ কর দেখি! বুঝব তোর বুদ্ধি! শিশিরের রহস্যময় চাহনি।

লিলি আন্দাজ করে ঃ মামা বুঝি ফের আবার ভূপর্যটনে বার হবে মনে করছ? তাই চুইংগাম, মামার পায়ে লাগিয়ে তাকে আটকে রাখতে চাও?

চুইংগাম যেমন চর্বণের—চর্বিত চর্বণের অন্তরায়, তেমনি নিশ্চয় ভূপর্যটনকারীর

পদে পদে বাধার সঞ্চার করবে, তার নিজের রোমন্থনের মুশকিল দেখে এই পর্যন্ত লিলি অনুমান করতে পারে।

তোর মাথা! —তোর কিচ্ছু মাথা নেই! তুই একটা গাধা। শিশির সাদা বাংলায় বলে দ্যায়।

মুখে লাগালেও মানে বুঝতুম। পাছে মামা প্ল্যানের খবর আর কারো কাছে ফাঁস করে দ্যান সেই কারণে মামার মুখ বন্ধ করার মতলবে—

মোটেই না, মোটেই—না! শিশির বাধা দিয়ে বলেঃ কেন চুইংগাম কিনলাম বলি। মামা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মাথা খাটিয়ে প্ল্যানটার রহস্যভেদ করচে। করেনি কি?

নিশ্চয়। মামার কার্যকারিতায় লিলির অগাধ বিশ্বাস।

আর আমি মামার পা খাটিয়ে তার সমস্ত জেনে নেব। শিশির জানায়।

পা খাটিয়ে? মামার পা? —লিলি আবার গোলক-ধাঁধার মধ্যে পড়ে, কিচ্ছু বুঝতে পারে না।

এই চুইংগাম এখনই গিয়ে মামার যাবতীয় জুতো স্লিপারের তলায় ভালো করে এঁটে দেব। তাদেরই একজোড়াকে পায়ে দিয়ে তো মামা সেই গুপ্তকক্ষের সন্ধানে বেরুবে। আর যে-যে ঘরের ভেতর দিয়ে যেখান দিয়েই যাক না—মামার প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে চুইংগামের চিহ্ন থেকে যাবে। চুইংগামরা তো সহজ পাত্র নয়!

লিলি অবাক হয়ে দাদার বুদ্ধির বহর দ্যাখে, তার মুখ দিয়ে কথা সরে না।

বাড়ি ফিরে লিলি আর শিশির জুতোদের খোঁজখবর নিতে যাবে, এমন সময়ে মামার রুদ্ধঘরের ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর শোরগোল শুনতে পায়।

—তুমি তাহলে এই বাড়ি আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি নও? অপরিচিত কণ্ঠের বাজখাঁই আওয়াজ।

নাঃ, কিছুতেই না। মামার গলা।

ভেবে দ্যাখো, আমি কদ্দূর থেকে এসেছি? কী রকম বিপদ ঘাড়ে নিয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে—

আমার বয়েই গেল!

এ বাড়ি হাতে রেখে তুমি কী করবে? পুরোনো পচা বাড়ি—এর ভাড়াটেও পাবে না কোনোদিন। এর ইট কাঠ কড়ি বরগারই বা কত দাম হবে? যদি চাও উচিত মূল্যের বেশি দিয়েও আমি এটা কিনে নিতে পারি।

হ্যাঁ, এই বাড়ি আমি বেচতে গেছি কিনা! মামার জবাব শোনা যায়ঃ এ বাড়ির দাম আমার জানা আছে। তোমাকে আর বেশি করে আমায় জানাতে হবে না।

হুম। অপরিচিত গলার সুর এবার বদলায়ঃ হুম বুঝেচি। এই বাড়ীর কোনোখানে গুপ্তধন লুকানো আছে, তুমি ভেবেচ বোধ হয়? যদি লুকোনোও থাকে, কোনোদিন তুমি তার সন্ধান পাবে না। তার প্ল্যানই খুঁজে পাবে না কোনোদিন। সারা জন্ম খুঁজলেও তোমার ও হাঁদা বুদ্ধির কর্ম নয়।

পাব কী পাব না, পেয়েচি কী পাইনি—সে আমি বুঝব! মামা জানায় ঃ তোমাকে বলতে গেছি আর কি! কী আমার গুরুঠাকুর এলেন!

বটে? এই কথা? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। যদি না দেখেনি, তাহলে আমার নাম—আমার নাম—

বলতে বলতে ঝাঁঝালো গলায় ভদ্রলোক দরজা খুলে তিরবেগে বেরিয়ে যান।

শিশির ও লিলি সিঁড়ির আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দ্যাখে—সবিস্ময়ে তাকিয়ে দ্যাখে—তর্জনগর্জনকারী নবাগতটি আর কেউ নন, তাদের সদ্য পরিচিত শ্রীমান বক্কেশ্বর আইচ।

সারাদিন শিশির আর লিলি ওত পেতে থাকে, মামার সবকটা জুতোর পরিচর্যা সেরে, মামাসুলভ গতিবিধির মাঝখানে, এখানে সেখানে, মামার যাত্রাপথের সর্বত্র, প্রলোভনজনক করে ছড়িয়ে রেখে দ্যায়। যেদিকেই মামা পা বাড়াবেন, একজোড়া পাবেন—তাঁর পায়ে পড়ার জন্য তারা অপেক্ষা করছে। জুতোর জন্যে মামাকে ইতস্তত করতে হবে না—পায়ের গোড়ায়—গোড়ালির আগায়—পায়চারির নাগালেই ওরা পড়ে রয়েচে।

কিন্তু সমস্ত বজ্র আঁটুনিরই ফসকা গেরো আছে—সারাক্ষণ মামার জুতোদের (এবং মামাও বাদ নয়) নজরে নজরে রেখে, বিকেলের দিকে বাড়ির সামনের রাস্তা

লোকটা একটা জলজ্যান্ত বিভীষিকা। তাই না—দাদা?

বিভীষিকা? বিভীষিকা কেন? একটুও বিভীষিকা না। অন্তত আমার কাছে তো নয়। তবে হ্যাঁ, জলজ্যান্ত বটে। আমিই তো আজ সকালে ওকে জল থেকে জ্যান্ত করেছি।

তোমার একটুও ভয় করেনি?

একটুও না।

তবে কাঁপছিলে কেন অমন করে? লিলি জানতে চায়।

আমি কাঁপছিলুম? আমি? আমি না তুই? শিশিরের উল্টো চাপ।

আমার তো হাত-পা কাঁপছিল! লিলি সমস্ত দোষ অসহায় হাত-পা-র ঘাড়ে চাপিয়ে দ্যায়। পা-হাত কেবল।

তাহলেই হল! আর তুমি যদি আমাকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরে অমন করে কাঁপতে থাকো—তুমিই হও আর তোমার হাত পা-ই হোক—তখন না কেঁপে আমি করি কী? শিশির নিজের অনুকম্পার কারণ দেখায়ঃ ভাগ্যিস তুমি কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাওনি—তাহলেই হয়েছিল আর কি! আমাকেও চিৎপাত হতে হত সেই সঙ্গে।

লিলির আনুকূল্যে শিশিরের যে অনিবার্য অধোগতি ঘটতে পারত, অথচ ঘটেনি—তার জন্যে লিলিকে দায়ি করায়, লিলির রাগ হয়ে যায়। যা ঘটেনি তার সে কী কৈফিয়ত দেবে? সে চুপ করে থাকে।

কিন্তু যাই বল, গুলিটুলির চলাচলের সময়ে অত কাছাকাছি থাকা ভালো নয়। এমন করে আমার পিঠ লেপটে এক হয়ে থাকা তোর ঠিক হয়নি। শিশির ভালো করে সমঝে দ্যায়ঃ আমার আড়ালে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে ভালো হত।

লিলি কিছু বলে না। তার অভিমান হয়ে যায়। তার কী দোষ? সে কি গায়ে পড়ে দাদার পৃষ্ঠপোষকতা করতে গেছল? দাদাই তো তাকে আড়াল করে নিজের পৃষ্ঠ রক্ষা করেছিলেন! সে কথা এখন ওঁর মনে পড়ছে না। বা রে!

যেমন পিঠ আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলি, গুলি ছুঁড়লে মজাটা টের পেতিস। গুলিটা আমাকে ভেদ করে তোর ভেতরে গিয়ে সেঁধতো। গুলিদের কি ভেদাভেদ জ্ঞান আছে? মেয়েছেলে বলে একটুও খাতির করত না! সোজা ফুঁড়ে এসপার-ওসপার হয়ে বেরিয়ে যেত!

যেত—যেত—লিলির যেত—দাদার কী? উনি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে গুলির যাতায়াতে কতটা বাধা-সৃষ্টি করছেন, শুনি? নেহাত সেই জলজ্যান্ত বিভীষিকাটা ঠিক সময়ে এসে পড়ল বলেই না? তাই বলেই না ফাঁড়াটা অত সহজে কেটে গেল—ভুল পথে দিয়ে কেটে বেরিয়ে গেল ফাঁড়াটা।

লিলি গুম হয়ে থাকে। কোনো জবাব দ্যায় না।

হঠাৎ সেই অন্ধকারের নিরন্ধ্রতা খানখান করে খনখনে আওয়াজ ফেটে পড়তে থাকে—

তাদের মামার আর্তনাদ—

বক্কেশ্বর আইচ ব্রজেশ্বর বড়ুয়ার হাত থেকে পিস্তল, প্ল্যান, পরিশেষে টর্চটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে পলায়ন করার পর, এতক্ষণ পরে, তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হায় হায় করে ওঠেন!

যাক, মামার কিছু হয়নি, বাঁচা গেল! শিশির বলে ঃ এতক্ষণ ধরে মামার কোনো সাড়া না পেয়ে ভাবছিলুম মামাকে বুঝি সাবাড় করে গেছে! কিন্তু এতক্ষণে—প্রত্যক্ষ না দেখা গেলেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে মামাকে।

হুম—একেবারে না মেরে ফেলতে পারলেও, মামাকে নিয়েও তো পিঠটান দিতে পারত লোকটা!

হ্যাঁ, মামা যা বহুমূল্য একটি রত্ন! কিন্তু লোকটার নিজের পিঠের উপর টান আছে বলেই মামাকে নিয়ে পিঠটান দ্যায়নি! একটা মামার বোঝা তো বড়ো কম নয়! শিশির হাসে। একবার পিঠে করে দ্যাখ না!

তার কাছে তো ভাগনের বোঝা! লিলি বোঝাবার চেষ্টা করে ঃ মামা তো সেই লোকটির ভাগনেই তো!

মামার কাতরোক্তি ক্রমশ বেড়েই চলে। অন্ধকারে কোনখানে দাঁড়িয়ে যে তিনি অনুশোচনা করছেন ঠিক ঠাওর হয় না, তবু ওরই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে, শব্দের ধার আর ক্রন্দনের ধারা অনুসরণ করে যারপরনাই বিলাপকারীর কাছাকাছি গিয়ে তারা দাঁড়ায়।

মামা! মামা! ডাক ছাড়ে শিশির।

আর মামা! ব্রজেশ্বর চেঁচিয়ে ওঠেন ঃ তোদের জন্যেই আমার এই সর্বনাশ আজ!

আমাদের জন্যে! আমাদের জন্যে কেন? শিশির একটু বিস্মিতই।

একদিকে তোরা—ভাগ নেবার ভাগনেরা। আরেক দিকে মামা—সাক্ষাৎ মামা! সর্বস্ব নেবার মামা! দুদিকেই ভারী পাল্লা—কোনদিক আমি সামলাই? বিক্ষুব্ধ আক্ষেপ ব্রজেশ্বরের!

তা—আমরা—আমরা কী করলাম? শিশিরের বিমূঢ় প্রশ্ন।

তোরা আর কী করবি? কিছুই করতে পারলিনে! মামাই সর্বস্বান্ত করে চলে গেল! ব্রজেশ্বরের আফশোশ বাগ মানে না ঃ বাঘ এসে পড়লে বেড়ালেরা কি কিছু করতে পারে? বেড়ালদের সুবিধা করতে দেবে—বাঘরা সে পাত্রই নয়! তারা নিজেরাই সব সাবড়ে দিয়ে যায়, বেড়ালদের জন্যে ছিটে-ফোঁটাও রাখে না!

তাহলে আর আমাদের কী দোষ?

তোদের আর দোষ কী? টর্চ-ফর্চ কিছু আছে সঙ্গে?

কিচ্ছু না!

তবেই হয়েছে! তবে এই অন্ধকারের গর্ভ থেকে কী করে আমরা বেরুব? মামার সকাতর কণ্ঠ। পিস্তল-টিস্তল আছে? তাও নেই? পিস্তল নেই টর্চ নেই—বাছারা এসেচেন গুপ্তধনের সন্ধানে!—মামার হঠাৎ ভারী রাগ হয়ে যায় ঃ ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। গুপ্তধন নেবেন? আবদার দ্যাখো না!

সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেই, কাকে বলা যায় না, আস্পর্ধার সেই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দুটিকে অঙ্গুলি-নির্দেশে তিনি দেখাতে চান।

দেখাতে চান বটে, কিন্তু নিজে তিনি দেখতে পান না। নিদর্শন দুটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে দর্শন পেলে এই দণ্ডেই এইসা এক চড় কসিয়ে মনের সমস্ত ঝাল মিটিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র তাঁর কার্পণ্য হত না।

৭
অন্ধকারের বিভীষিকা

কেন, পিস্তল না থাকলে কী হয়? লিলি জানতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে ঃ পিস্তল থাকলে কী হত মামা?

চামচিকেরা এই অন্ধকারের মধ্যে কী রকম ফরফর করছে দেখছিসনে? না দেখলেও, শুনতে পাচ্ছিস তো? গায়ে মুখে এসে ঝাপটা লাগালেই হল। পিস্তল থাকলে এক্ষুনি ওদের ফরফরানি বন্ধ করে দেয়া যেত। একটি আওয়াজ করলেই—ব্যস। গুড়ুম শুনলেই, দুদ্দাড় করে পালিয়ে যেত সব। দিগ্বিদিকে উধাও হয়ে যেত। গুড়ুমকে ভয় করে সবাই। ওর নাম আক্কেলগুড়ুম।

জানিস তো লিলি, ওরা ভারী চুল ছেঁটে নেয়, ওই চামচিকেরা! মাথায় এসে ঝাপটালেই বুঝবি খানিকটা চুল খুবলে নিয়ে গেছে—! শিশিরও উড্ডীয়মান ওই দুরন্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে পারে না—নির্ঘাত নিয়েছে।

লিলি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, মাথায় হাত চাপা দিয়ে নিজের কেশদাম রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। খুবলে নিলেই হল আর কি? চুলের দাম নেই? আঙুল-ঢাকা দিয়ে চুল বাঁচিয়ে লিলি মামার বিশাল বগলের তলায় এসে মাথা বাঁচাতে চায়,—এই অন্ধকারে ওই চক্রাকারে উড়ন্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষার এ ছাড়া আর কী উপায়?

এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করা যাক, এসো মামা! শিশির বলে ঃ কিন্তু দরজাটা কোন দিকে, তোমার মনে আছে?

আরে তাই যদি মনে থাকবে তাহলে তো কোনকালে বেরিয়ে পড়তুম! তোদের জন্যে অপেক্ষা করতুম নাকি? এক মিনিটের জন্যেও দাঁড়াতুম না তাহলে! মামা বলেন ঃ এই বিচ্ছিরি অন্ধকার আর ভ্যাপসা গন্ধের মধ্যে কি এক মিনিটও দাঁড়ানো যায়? কোনো ভদ্রলোক দাঁড়াতে পারে?

একটু থেমে মামা আবার বলেন ঃ কেন, তোদের মনে নেই? তোরা তো এই মাত্র এলি? পথে দেখে আসিসনি? এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিয়েছিস? এই মেমারি নিয়ে কী করে যে তোরা পরীক্ষা পাস করবি তাই আমি ভাবি!

আমরা কি আর পথ দেখে এসেছি? আমি তো চুইংগামের চিহ্ন দেখতে দেখতে এলাম। শিশির জানায়।

আর আমি তো দাদাকে দেখতে দেখতে এসেচি। বিনা জিজ্ঞাসাতেই লিলি নিজের জবাব দিয়ে দ্যায়—আগে থেকেই!

মাথা কিনে নিয়েচ! এই জন্যেই না বলে যে জন জামাই ভাগনা তিন না হয় আপনা—মিথ্যে কথা বলে কি? ভেবে দেখলে, তিনটেই অপদার্থ!

বারে। তোমার নিজের বাড়ি! এর ঘরদোর রাস্তা সবই তোমার মুখস্থ—আর তাই যখন তোমায় নিজেরই মনে নেই তখন আমরা তো আজকের ছেলে! আজকেই তো এই বাড়িতে পা দিলুম? আমাদের মনে থাকবে?

আমার কী করে থাকে, শুনি? মামার ঝাঁঝালো জবাব ঃ এই ঘোরালো ঘরটা যে এই বাড়ির ভেতরেই ছিল তাই আমি জানতাম না। প্ল্যান দেখে দেখে তো এলাম। তারপর যখন এক মনে গুপ্তস্থানটা খুঁজে বার করছি তখন তোরা এসে গোলমাল বাধালি—তখনো হয়তো বার-পথের একটা আন্দাজ ছিল, তারপর সেই হতভাগা মামাটা এসে সব গুলিয়ে দিল। ক-বার এগুলাম, কবার পেছুলাম,—কতবার ঘুরপাক খেয়েছি—কিছু কি ছাই মনে আছে? তারপর এখন তো ঘুটঘুট্টি আঁধার! মামাটা আবার এমন বেয়াক্কেলে যে টর্চটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে। ক্ষণেক থেমে আবার তাঁর আক্ষেপোক্তি হয় ঃ প্ল্যানটাও ছাড়েনি।

প্ল্যান নিলি নিলি, বেশ করলি! টর্চটা আবার নিতে গেলি কেন? লিলিও অনুযোগ করে ঃ আমরা অন্ধকারে বেরুব কী করে সে হুঁশ নেই?

মামারা এমনিই বটে! মামা তার নিজের মামার নজির এনে নিজেদের জের টানেন।

সেজন্য তুমি আফশোশ কোরো না মামা! ওর খর্পর থেকে তোমার প্ল্যান আমি উদ্ধার করে আনব! তোমায় এনে দেব, তুমি দেখে নিয়ো—দুঃখ কোরো না তুমি। কেবল একবার ওর দেখা পেলেই হয়। শিশির ভরসা দ্যায় ঃ কিন্তু যাই বল মামা, তোমার মামাটি গ্র্যান্ড।

গ্র্যান্ড? কেন গ্র্যান্ড কেন? কীসের জন্যে গ্র্যান্ড—শুনি? মামা ভারী খাপ্পা হয়ে যান।

মামার মামা তো এমনিতেই গ্র্যান্ড মামা, তাই নয় কি? আপনা থেকেই তো গ্র্যান্ড? শিশির শুধরে নিতে চায় ঃ বাবার বাবারা যেমন গ্র্যান্ডফাদার!

হুঁঃ! মামারা কক্ষনো গ্র্যান্ড হয় না! মামার মামা হলেও না। ভারী বদ হচ্ছে এই মামারা, আমি বলে দিতে পারি। মামা তৎক্ষণাৎ বলে দ্যান ঃ ভাগনেদের চেয়ে কোনো অংশে কিছু কম খারাপ নয়। বলে দিতে বিন্দুমাত্র তাঁর কুণ্ঠা হয় না।

মামার এই ব্যাখ্যানও বরং সহ্য হয়, কিন্তু চামচিকেদের ঝড়ঝাঁপ কতক্ষণ সওয়া যায়? শিশির অস্থির হয়ে উঠল—যে করেই হোক, এই অন্ধকারের চক্রব্যূহ থেকে বার হতেই হবে।

এই মুক্তির অভিযানে যে নেতৃত্বপদ নেয়, লিলি তার অনুগামিনী হয়—এবং মামাও শোক সম্বরণ করে তাদের পিছু নিতে দ্বিধাবোধ করে না।

কিন্তু দরজা যে কোন্ ধারটায় তার হদিশ পাওয়া দায়! এ কোণে ধাকা খেয়ে ও কোণে ঢুঁ মেরে ইঁদুরদের দ্বারা তাড়িত হয়ে, দেয়ালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে, অবশেষে, একধারে উঁচু শান-বাঁধানো একটু জায়গা হয়ে হতাশায় ক্লান্ত হয়ে ওরা বসে পড়ে। শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ঃ না, এই গোলক-ধাঁধা থেকে আজকে আর বার হওয়া যাবে না। রাত্রের মতো এখানেই থাকতে হবে দেখছি।

তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন যে এ দশা হবে, আগে থেকেই আমি জানি! মামা গজগজ করেন।

এই জায়গাটা একটু উঁচু রয়েছে। শান-বাঁধানোও আবার! ইঁদুররা এতদূর উঠতে পারবে না আমার ধারণা। আয় লিলি, শুয়ে পড়া যাক! গা গড়িয়ে জিরিয়ে নেয়া যাক একটু।

আমার চোখ জড়িয়ে আসচে দাদা! বসতে না বসতে তার ঘুম পায়—শুতে পেলেই সে বাঁচে!

ঘুমোতে পারিস। আমি পাহারায় জেগে থাকলাম। মামা তুমিও একটু ঘুমিয়ে নিতে পার। কোনো ভয় নেই।

হ্যাঁ, ভয়ে তো আমি কাঠ হয়ে রয়েছি, তা আর বলতে! বলতে বলতে মামা লম্বা হয়ে পড়েন। একটু পরেই তাঁর নাক ডাকতে থাকে। লিলিরও নিশ্বাস ভারী হয়ে আসে।

শিশিরের চোখে ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে জেগে জেগে আজকের সকাল থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া সে ভাবে। প্ল্যান উদ্ধার থেকে প্ল্যান হারানো পর্যন্ত!.....আর সেই জলজ্যান্ত লোকটার অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা। থানার গায়ে

লটকানো সেই পুরস্কার ঘোষণার নোটিশ। একটার পর একটা সমস্ত তার মানসপটে উদিত হতে থাকে।

পকেট থেকে বার করে মাঝে মাঝে চুইংগাম মুখস্থ করে আর কি করে দুর্ধর্ষ বক্কেশ্বর আইচের কাছ থেকে প্ল্যানটার পুনরুদ্ধার করবে, এই নিয়ে সে মাথা ঘামায়।

অনেক —অনেকক্ষণ পরে—হঠাৎ একটু খুট্! ইঁদুররাই হয়তো! শিশির আমল দ্যায় না। কিন্তু একটু পরেই আবার খট্ খটাখট্!

শিশিরকে উঠে বসতে হয়। ইঁদুরদের খটখটি তো এত জোর হবার কথা নয়! অন্য কারো নটখটি হবে। ভূত—ভূতরাই নাকি তবে?

শিশির সভয়ে অন্ধকারের চারিধারে ধারালো দৃষ্টি চালাতে থাকে। এধার ওধার থেকে, অন্ধকার ফুঁড়ে, কালো কালো ছায়ামূর্তিরা উঁকি-ঝুঁকি মারবে, হয়তো বা কঙ্কালদেহীরা দেহি দেহি রবে এগিয়ে আসবে—পুনঃপুনঃ তাদের হিহি হাসি শুনতে পাবে হয়তো, এই রকমটা প্রতি মুহূর্তেই সে প্রত্যাশা করে। কিন্তু না, সেরকম কিছু দেখা যায় না।

অবশ্যি, একটু আগে সে, তন্দ্রার ঘোরে, তিনটি নরকঙ্কালকে করমর্দনের অভিপ্রায়ে গিয়ে আসতে দেখেছিল—কিন্তু চটকাটা ভেঙে যেতেই চোখ মেলে দ্যাখে, সব ফাঁকা! ফাঁকি সব! কোথাও কিছু নেই!

কিন্তু তথাপি সেই খুট—খাট—খুট! খুটখুটনি বেড়েই চলে ক্রমশ—

খুট—খাট—খটাং! কার এই সব খুঁটিনাটি?

এবার যেন দূরে—অতি দূরে—অন্ধকার বিদীর্ণ করে এক ফালি আলোর মতো কী যেন ঘোরাফেরা করছে বোধহয়!

আলেয়া নয়তো?

ভূতেরা—খুব সম্ভব মেয়ে-ভূতেরাই—অনেক সময়ে আলেয়ার ছদ্মবেশে আসে বলে শিশিরের শোনা আছে। সে নড়েচড়ে বসে। তার বুক দুরদুর করে। লিলির পায়ে পা ঠেকিয়ে ছুঁয়ে থাকে।

লিলির ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না, ভয় পেয়ে যাবে ছোটো বোন—আর,—আর মামার ঘুম ভাঙাতেও তার সাহসে কুলোয় না।

অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে ভূতের কার্যকলাপ লক্ষ করে।

সেই ভৌতিক আলোটা এবার এগিয়ে আসে। এসে এক জায়গায় থামে। চারধারে কী যেন খুঁজে ফেরে। এগোয়, একটু এগোয়, আবার থামে। অবশেষে একটা দেয়ালের গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়।

দেয়ালে ধাক্কা-খাওয়া আলোর প্রতিচ্ছায়ার চারধারের আশপাশ ঈষৎ যেন আভাময় হয়ে ওঠে। তার আবছায়ায়, আলোর আড়ালের ছায়া-মূর্তিটিকে এবার দেখা যায়। ছায়ামূর্তি হাত-পা নাড়ছে, বেশ স্পষ্ট করেই শিশিরের চোখে পড়ে এবার।

শিশিরের কৌতূহল এবার তার ভয়কেও ছাপিয়ে ওঠে। আলো হাতে, এ আবার কীরকম ভূত রে বাবা? ভূত, কিংবা ভূতের ছদ্মবেশে অন্য কোনো গুপ্ত-রত্নসন্ধানী? খোদার উপর খোদকারী করা গুপ্তধনের অভিলাষী দুঃসাহসিক আর কেউ?

জানবার অভিপ্রায়ে, (এবং বাধাদানের মতলবেও), শিশির মুখের চুইংগামটা বার করে সেই ছায়ামূর্তিটিকে ছুঁড়ে মারে।

গায়ে লাগতেই ছায়ামূর্তিটি চেঁচিয়ে ওঠে: 'ইস্! এ আবার কীরে বাবা? কোত্থেকে এল? য়্যাঁ? কোনো ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি?'

ছায়ামূর্তিটা বিচলিত হয়। শিশির আরেকটা চুইংগামকে রসায়িত করে কসে লাগায়!

ইস্! কী এগুলো! ভারী ল্যাটপ্যাট করছে! টেনে ছাড়ানো যায় না—কীরে বাবা! চটচটে দেখছি আবার!

ছায়ামূর্তিটি আপনমনেই মন্তব্য করে।

শিশির ক্ষান্ত হয় না, একটার পর একটা, অশ্রান্তভাবে লাগাতে থাকে!

ছায়ামূর্তিটি ভারী বিব্রত হয়ে পড়ে। এগুলো গায়ে লাগে, পেছুলে পায়ে লাগে, কী করবে ভেবে পায় না। তার উপরে যা চটচটে! চটাচটি করেও ছাড়ানো যায় না। ভারী মুশকিলে পড়ে যায় বেচারি! অথচ, কোত্থেকে যে ওইসব চট্টোপাধ্যায়রা আসছে, চটপট এসে পড়ছে, কিছুই বুঝতে পারে না।

যেখানেই পা ফ্যালে, চুইংগামে আটকায়—পা তোলা, এবং তুলে পুনরায় ফেলা দুরূহ হয়ে পড়ে—যেদিকেই এগোয়, পা আটকাতে আটকাতে চলে। অগত্যা এক পা

তুলে ছায়ামূর্তিটি খানিকক্ষণ ভাবে—(এক পা-ই তুলে রাখে, যতটুকু বাঁচোয়া। দু-পা তো এক সঙ্গে তোলা যায় না!)—তারপর সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে ঃ

'বুঝেছি। এ হচ্ছে যুখের ধন! যক্ষেরা সব আগলাচ্ছে একে! রাত্তির বেলা ওদের চোখের সামনে থেকে এ চিজ বাগানো যাবে না। —ইস্! এবার একটা আমার নাকের উপর এসে লেগেছে! যখন নাকে লেগেছে তখন আর না। নাক নিয়ে পালানো যাক!'

এই বলে আরো আক্রমণের অপেক্ষা না রেখে দুপ্‌দাপ্ করে অন্ধকারের মধ্যেই সে চোঁচোঁ দৌড় মারে।

৮

ছাগলের রাজপথ পেরিয়ে

যে রকমটা ভাবা গেছল, শিশির যেটি আশা করেছিল, তাই ঘটে রয়েছে দেখা গেল। রাতারাতি একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এ রকম দৈব সহায় না থাকলে বড়ো বড়ো ডিটেকটিভকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। এই জাতীয় আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে বলেই শার্লক হোমস, রবার্ট ব্লেক, শিশির প্রভৃতি গোয়েন্দারা সুবিধা করে নেয়, পদে পদে বিপদ হানা দিয়েও কিছু করতে পারে না—যৎপরোনাস্তি বাধা পেয়েও শেষমেশ তারা কার্যোদ্ধার করে বসে।

স্বয়ং প্রকৃতিই ওদের—ওই বদমাশদের বিরুদ্ধে। ওদের নিজেদের প্রকৃতি নয়—বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির কথাই বলা হচ্ছে।

তাই, ইতিমধ্যে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এবং শিশির অন্ধকার ব্যূহ থেকে বার হবার মাত্রই দেখল, হ্যাঁ, যেমনটি তার প্রত্যাশা ছিল তাই বটে! বৃষ্টিও হয়েছে এবং তার ফলে ভেজা মাটির উপরে বেশ গভীর হয়ে কার যেন পায়ের দাগ চেপে বসেছে।

পৃথিবীর ছোটো বড়ো মেজো সেজো সব ডিটেকটিভ যে সুবিধা পেয়েছে, বরাবর পেয়ে আসছে, শিশিরও যদি তার উপরে নির্ভরতা পোষণ করে থাকে, বিশেষ অন্যায় কিছু করেনি। এবং প্রকৃতিও যদি তার উপযুক্ত কাজ করে থাকে, কিছু অন্যায় হয় না। এস্থলে প্রকৃতি শিশিরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি—প্রকৃতি বিরুদ্ধ আচরণ করেননি কিছু।

এবং সেই পায়ের দাগ, মোটা মোটা পায়ের গোদা গোদা ছাপ চলে গেছে—তাদের বাড়ির আনাচ পেরিয়ে, পাশের বাগানের কানাচ ঘেঁষে—সেই দাগরাজি, পথের সেই দাগি পৃষ্ঠাটি বরাবর চলে গেছে—

কোথায় গেছে, সেইটাই তো শিশিরের এখন আবিষ্কার্য—তা ছাড়া আর কী?

শিশির মাথা নেড়ে মুখ নেড়ে তার মামাকে জানিয়ে দিয়েছে ঃ কাল রাত্রে যে এসেছিল সে তোমার মামাই বটে। তোমার মামা ছাড়া আর কেউ নয় মামা।

বাঃ, মামাই তো! মামা ছাড়া আবার কে হতে যাবে। ব্রজেশ্বর বিকৃত মুখে জবাব

দিয়েছেন ঃ মামাই তো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে প্ল্যানটা! নইলে আর কোনো মিঞার সাধ্য ছিল না!

উহু, তারপরেও ফের আবার এসেছিল যে!

ফের এসেছিল? তুই স্বপ্ন দেখছিলি নাকি?

ব্রজেশ্বর এবার একটু বিস্মিতই হন ঃ ফের আবার কে আসবে? ফের কেন আসতে যাবে শুনি? প্ল্যান তো সে আগেই নিয়েছে—নিয়ে গেছে—এই হাত থেকেই হাতিয়ে নিয়ে ভেগেছে! তবে?

শিশির সে কথার জবাব দ্যায় না, শুধু বলে ঃ এবার তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো মামা! আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার প্ল্যান যদি না আমি উদ্ধার করে আনি তো কী বলেছি। সন্ধের মধ্যেই এনে দিচ্ছি তোমায়।

হ্যাঁ, সে প্ল্যান আর উদ্ধার করতে হয় না। ব্রজেশ্বর অবিশ্বাসের হাসি হাসেন ঃ আমার মামাকে তুই তো চিনিস না! চিনি আমি! মামাদের খর্পর থেকে জিনিস বাগানো সহজ নয়।

আমার তো আর মামা না! আমি পারব। শিশিরের সুদৃঢ় আস্থা।

মামার মামা—সে আরো বড়ো কঠিন ঠাঁইরে! বলে আমি যাই সেয়ানা তাই পেরে উঠলুম না, পেয়েও হারালুম,—আর তুই তো কালকের ছেলে, সামান্য ভাগনে—ভাগনের ভাগনে মাত্র, তুই পারবি! হ্যাঁ, থাকতো যদি আমার মামার মামা—পারত সে! কিন্তু—কিন্তু সে—সে কোথায়?

আকাশের দিকে ভ্রূপেক্ষ করে ব্রজেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জন দ্যান।

পারি কিনা পারি দেখে নিয়ো। লিলিকে সাথে নিয়ে এই আমি পা বাড়াচ্ছি। উদাহরণ-স্বরূপ, তক্ষুনি তক্ষুনি শিশির পাড়ি দ্যায়, মামার বাড়ির প্রাতরাশের জন্যও প্রতীক্ষা করে না।

মাতুলালয়ের পাশ ধরে, বাগানের ধার ঘেঁষে, ভিজে মাটির পিঠে তাজা পায়ের দাগ লক্ষ করে শিশিররা এগিয়ে চলে। আরো সব কত বাড়ির গা ঘেঁষে, অনেকখানি পথ বেয়ে, আরেকটা বাগানের ভেতর দিয়ে অনেকদূর ওরা চলে যায়। যেতে যেতে শহরের সীমান্তে গিয়ে ওরা পৌঁছোয়।

এবং তখনো—তখনো ওদের চোখে পড়ে—সেই পায়ের দাগ! সেই শ্রীপাদপদ্ম-রেখা আরো—আরো দূরে চলে গেছে!

যাক, তাতে ওদের দুঃখ নেই। কেবল চিহ্ন রেখে গেলেই হল! পথে একটা রেস্তরাঁয় সামান্য কিছু ওরা খেয়ে নিয়েছে—এখন পদচিহ্নের পথ ধরে—ওই পদাঙ্ক অনুসরণ করে—যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যেতে হয় তাতেও ওদের আপত্তি নেই। আর এই পায়াভারি ভদ্রলোক—পায়ের দাগের দাগি আসামি যেখানেই যান না কেন, যতদূরেই যান না, তাঁরও আর নিস্তার নেই ওদের হাতে,—শেষ অবধি যদি তিনি পা বজায় রেখে গিয়ে থাকেন—পা তাঁর ক্ষয়ে গিয়ে, কিংবা খোয়া গিয়ে না থাকে তাহলে তাঁকে ওরা পাকড়াও করবেই। নিশ্চয়ই।

এধারটায় ভারী ছাগলের আমদানি দেখা যাচ্ছে। শিশির অদূরবর্তী অবশ্যম্ভাবী এক পাল ছাগলের দিকে লিলির দৃষ্টি টানে।

আমরা শহরের বাইরে এসে পড়েছি দাদা! আসন্ন ছাগপালের দিকে তাকিয়ে লিলি বলে ঃ কী রকম মেঠো মেঠো এধারটা, দেখচ না!

হ্যাঁ, মাঠে চরাতে নিয়ে যাচ্ছে ছাগলদের। একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চ, আমরা পেরুবার আগে ওরা যদি এসে পড়ে তাহলেই পায়ের দাগের দফারফা!—সব ওরা নিজের পায়ের ক্ষুরে কামিয়ে দিয়ে যাবে।

ও বাবা! কত ছাগল! একশো—দুশো—তিনশো—না তারও বেশি? ছাগ-সম্প্রদায়ের সেনসাস নেবার লিলির আগ্রহ দেখা যায়।

এক হাজারের কম না! চচ—চ বলছি— কিন্তু বলতে বলতে ছাগলের পাল এসে পড়ল। বাঁ ধারের মাঠ থেকে, রাস্তা ডিঙিয়ে, ডান দিকের মাঠে গিয়ে পড়তে লাগল তারা—এই পারাপারের মুখে বিস্তর ছাগল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে, মাঠে না নেমে, রাস্তার দুদিকে রওনা দিতে চেষ্টা করল। তাদের এই উন্মার্গযাত্রায় নেতাদের পক্ষ থেকে বাধা ছিলই—পালের সাথে সাথে লাঠি হাতে কতকগুলি রাখালও রয়েছে দেখা গেল—তাদের দ্বারা পুনঃপুনঃ বাধা পেয়ে ব্যাহত হয়ে অবশেষে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

রাখালদের যেমন হৈ-হল্লা, ছাগলদেরও তেমনি চ্যাঁভ্যাঁ—সমস্ত মিলিয়ে কিছুক্ষণ ধরে, এমন এক বিপর্যয় বেধে রইল আর চারধার দিয়ে সেই উন্মত্ত ছাগস্রোত যেভাবে অট্টরোল করে ছুটে চলল, তাতে পাছে সেই ক্ষুরধার জনতার পায়ের তলায় পড়ে তারা নিজেরাই না শেষটায় চিহ্নমাত্রে পর্যবসিত হয়ে যায় সেই ভয়ে শিশির আর লিলি একটা উঁচু পাথরের ঢিবির উপর গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। এবং যতক্ষণ না শেষ ছাগলটি ত্রিসীমানা থেকে নির্বিঘ্নে অন্তর্হিত হয়েছে—ততক্ষণ তারা সেই ঢিবির উপর থেকে নামল না।

দেখলি তো! সব পণ্ড! কোথায় আর পায়ের দাগ? বেবাক চারধারে ক্ষুর বোলানো! শিশির আফশোশ করে।

চলো একটু এগিয়ে দেখা যাক। লিলি আশার বাণী শোনায় ঃ ঘুরে ফিরে দেখাই যাক না!

পায়ের দাগ যখন নেই তখন আর নাহক ঘুরে লাভ? কোনো সত্যিকার ডিটেকটিভ এমন বাজে কাজ করে না। চ ফেরা যাক—কিন্তু মামাকে মুখ দেখাবে কী করে তাই আমি ভাবচি।

আমার ভারী জলতেষ্টা পেয়েছে দাদা! লিলি বলে। আশার বাণীর পরেই তার মুখে তৃষ্ণার বারতা।

সামনেই ওই ছোট্ট বাড়িটাতে গিয়ে জল চাওয়া যাক! শিশির লিলিকে নিয়ে এগোয়—খুব দূরে নয় বোধহয়।

খুব দূর বোধ না হলেও, ছোট্ট বাড়িটা বেশ একটু দূরেই। ও ধারটা পাহাড়ের

ঢালুর থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেছে, সেই জন্যে আপাতদৃষ্টিতে যতটা মনোরম আর সন্নিকট বলে মনে হয় আসলে বাড়িটা তত কাছাকাছি নয়।

উপত্যকা উতরে, চড়াই বেয়ে ওরা বাড়ির নিকটে গিয়ে পৌঁছায়, সটান ভেতরে গিয়ে চড়াও হয়ে। কিন্তু বাড়ির কোথাও এতটুকু টুঁ শব্দ নেই, জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না।

পা টিপেটিপে ওরা এগিয়ে যায়। একটু ভয়ে ভয়েই এগোয়!

সামনের ঘরটা থেকে হঠাৎ চাপা গলার ফিসফাস ওদের কানে আসে : পিস্তলগুলোয় গুলি ভরে নিয়েছ তো?

পিস্তলের কথা কানে যেতেই তার একটা গুলি যেন ছিটকে এসে ওদের মর্মস্থল বিদ্ধ করে। অ্যাঁ? এখানেও পিস্তল? সেই পিস্তল আবার এখানেও? ছাগলের রাজধানী পার হয়ে এসেও ফের পিস্তল?—

একটা আধবোজা জানলার ধার ঘেঁষে ওরা দাঁড়ায়। দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। গরাদের ফাঁক দিয়ে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বাড়িয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মেরে দ্যাখে, চৌকোনা একটা টেবিল ঘিরে জন পাঁচেক ভীষণ চেহারার মানুষ, টেবিলের উপর ছড়ানো কী একটা কাগজের উপরে ব্যগ্র হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সেই পঞ্চ-পাণ্ডবের একজনকে দর্শন মাত্রই চেনা যায়, তিনি হচ্ছেন আর কেউ না, তাদের সেই গ্র্যান্ড মামা!—

৯
বেড়ালের ছদ্মবেশে ডিটেকটিভ !

টেবিলের উপর শায়িত সেই কাগজখানাও আর কিছু না, দূর থেকে কটাক্ষ করেই তারা বুঝতে পারে, সেই মোক্ষম প্ল্যান। মামার উপর টেক্কা মেরে, কেড়ে নিয়ে আসা গুপ্তধন আবিষ্কারের নির্ঘাত সেই নকশা!

শিশির লোলুপনেত্রে প্ল্যানটার দিকে তাকায় আর লিলির কানে কানে জানায় ঃ লোকগুলো কোনো কারণে একবার এঘর থেকে সরলে হয়! আমি টেবিলের উপর ছোঁ মেরে ওটা নিয়ে আসি।

আমি ভাবছি ওদের কেউ যদি আবার এই বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে—! লিলি তার ভয়াবহ আশঙ্কাটা ব্যক্ত করে ঃ বেরুবার চেষ্টা পায় যদি—?

তাহলে ভাবনার কথা বটে! ঘাড় নাড়ে শিশির। একটু ভাবনার কথাই বইকি!

বাস্তবিক, এদিকটা ওর চোখে পড়েনি, পালাবার পথ পরিষ্কার রেখে তবে এগুবার দিকে ঝোঁক দিতে হয়—তা নইলে দুঃসাহসিকদের জীবনে আর দ্বিতীয়বার জয়যাত্রার অভিযানে বেরুবার সুযোগ আসে না—সেই প্রথম মহাযাত্রাতেই তাঁরা তলিয়ে যান!

কোথা দিয়ে পালাব আমরা? লিলির মুখে সেই জিজ্ঞাসা—মহা মহা বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনের যা প্রথম ও শেষ প্রশ্ন।

পালাব কেন? প্ল্যান না নিয়েই পালাব? শিশিরের মৃদু আপত্তি ঃ প্রাণ দিয়ে যেতে হয় তাতেও রাজি কিন্তু প্ল্যান না নিয়ে এক পাও নড়ছি নে!

তাদের জানলাটার পরবর্তী জানলায় ঠেসানো একগাদা খালি প্যাকিং বাক্স খাড়া করা ছিল—সেই কাঠের বাক্সগুলোর চূড়ায় বসে একটা বেড়াল ঝিমুচ্ছিল বলেই মনে হয়।

আমরা ছদ্মবেশে এলেই পারতাম! বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে লিলি জবাব দ্যায় ঃ ভালো হত তাহলে!

তুই কি বলতে চাস আরেক জন ছদ্মবেশে এখানে এসেছে? শিশিরের অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠ ঃ ওই বেড়ালের ছদ্মবেশে ও কি অপর কোনো ডিটেকটিভ!

শিশির লিলির দৃষ্টি অনুসরণ করে সন্দিগ্ধ নেত্রে বেড়ালটার দিকে তাকায়।

শিশিরের প্রশ্নে লিলি ভালো করে লক্ষ করে এবার।

বেড়ালটার হাবভাব কেমন যেন! ঘুমোনোটা যে ওর ফাঁকি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঝিমুনোর ফাঁকে ফাঁকে দেখচ না ও মাঝে মাঝে চারধারে বেশ চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আর চেয়ে দ্যাখো দাদা, ওরও নজর ওই ঘরটার ভেতরে।

দেখেছি। শিশির গম্ভীর গলায় বলে। অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি।

কিন্তু তাহলেও ওকে বেড়াল ছাড়া আর কিছু বলে আমার মনে হয় না! লিলি তার তদন্ত-কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে।

আমারও তাই মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। তাছাড়া একটা ব্যাপারে দুটো গোয়েন্দা লাগা ঠিক হবে কি? আর তা লাগেও না কখনো।

কিন্তু আমরা ওই বাক্সগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়? ওখান থেকে ঘরটার ভেতরেও নজর রাখা যায় আর বেশ লুকিয়েও থাকা যায়।

এ-প্রস্তাব সমীচীন বলে মনে হয় শিশিরের। তারা দুজনে সেই প্যাকিং বাক্সগুলোর আবডালে গিয়ে খাড়া হয়।

বেশিক্ষণ ওদের দণ্ডায়মান থাকতে হয় না। তপস্যা বড়োই কী আর ছোটোই কী, বরলাভ তাতে অব্যর্থ। অচিরেই তাদের অভিষ্টসিদ্ধি হয়। নিজেদের রিভলভার বার করে, খুব সম্ভব ভরাট করবার মতলবেই ওরা পাশের ঘরে যায়! সেই পার্চমেন্ট কাগজের প্ল্যানটিকে টেবিলের উপরে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেই চলে যায় ওরা।

লিলি, এই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ! দাঁড়া তুই!

শিশির সেই জনবিরল ঘরে একক এগিয়ে আগে টেবিলটা হস্তগত করে—তারপরে প্ল্যানটাও ঠিক বাগিয়ে নিয়েছে—এমন সময়ে, অঘটন আর বলে কাকে?

শিশিরের আকস্মিক গৃহপ্রবেশে বেড়ালটা ততটা বিচলিত হয়নি, একটা চোখ খোলা এবং আরেকটা বোজা রেখেই, নিরুদ্বেগে ওর কার্যকলাপ লক্ষ করছিল, কিন্তু টেবিলের উপরে শিশিরের হস্তক্ষেপ দেখবামাত্রই তার ভাবান্তর ঘটল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারী বিপর্যয় ঘটে গেল। প্যাকিং বাক্সের মাথা থেকে সে এক লাফ মারল—ঠিক লিলির মাথায় নয়—লিলির মাথা বাঁচিয়ে জানলার গোড়াতেই লাফটা দিল, কিন্তু তার এই কক্ষ-পরিবর্তনের তৎপরতায়—ধূমকেতুরা যেমন সুযোগ পেলেই সমাদরে পৃথিবীর উপরে ল্যাজ বুলিয়ে দিয়ে যায়,—সেও তেমনি লিলির মুখের উপর নিজেরটা বুলিয়ে নিয়ে গেল।

লিলি হাঁউ মাঁউ করে উঠল। এবং তার কেবল ওই চিৎকার ছাড়াই নয়, সেই সঙ্গে চতুর্দিকে এমন হাত পা ছুড়ল যে তার প্রতিক্রিয়ায় উঁচু করে খাড়া করা সমস্ত প্যাকিং বাক্স, যেন অকস্মাৎ ভূমিকম্পে, ভয়ানক শব্দে একটার পর একটা—এবং সবগুলো পিঠোপিঠি ধুপধাপ করে পড়তে শুরু করল।

কেবল হাঁউ মাঁউই মানুষের গন্ধ পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তার উপরে মানুষের শব্দ কানে যেতেই অন্য ঘরে রাক্ষসদের টনক নড়ল।

শিশির অবশ্যি ততক্ষণে খসড়াটা হাতিয়ে বেগে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। বার হয়েই, লিলিকে সেই পতিত এবং পতনোন্মুখ প্যাকিং বাক্সদের কবল থেকে এক হ্যাঁচকায় উদ্ধার করে তিন লাফে পগারপারের দিকেই ছিল কিন্তু এদিকেও তখন গ্র্যান্ড মামার দল, প্যাকিং বাক্সদের আর্তনাদ শুনে পিস্তলদের ভর্তি করে মার মার শব্দ দুদ্দাড় করে বেরিয়ে পড়েছেন।

ওই—ওই পালাল। প্ল্যান নিয়ে পালাচ্ছে ওই! —গ্র্যান্ড মামা নিজেই এবার আর্তনাদ করে উঠেন।

অমনি সবার পিস্তল থেকে তাদের উদ্দেশে ঝমাঝম গুলিবৃষ্টি হতে শুরু হয়। কিন্তু হলে কী হবে, ততক্ষণে তারা রিভলভার রেঞ্জের বাইরে।

দেখচ কি! বন্দুক নিয়ে এসো! পালাল যে—পিস্তল হাতে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখচ কী সব? বক্কেশ্বর আইচ চিৎকার করে ওঠেন।

দেখতে দেখতে বন্দুক এসে পড়ে।

দুড়ুম—দুড়ুম—দুম! বন্দুকেরা গর্জন করে ওঠে। একাদিক্রমে এবং একসঙ্গে দুমদাম লাগায়।

লিলি, ঘাবড়াস নে। বন্দুকে আমাদের ভয় নেই। দৌড়তে দৌড়তে ছোটো বোনকে আশ্বাস দ্যায় শিশির। ও সব গুলি আমাদের কানের আশপাশ দিয়ে চলে যাবে। ছোঁবেও না আমাদের, তুই দেখে নিস! কেন, অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে তুই পড়িসনি?

হুম লিলি শুধু বলে। লম্বা লম্বা পা ফেলতে হলে লম্বা লম্বা কথা বলা যায় না।

শিশিরের কথা মিথ্যে নয়—বন্দুকের ওই দুড়ুম দুড়ুম আওয়াজই সার! ওদের আগপাশতলার কোথাও লাগা দূরে থাক—এক নম্বরের স্ফূর্তিবাজের মতো—গুলিগুলো ওদের আশপাশ ঘেঁসে শিস দিতে দিতে চলে যায়।—শিশিরের সীমান্ত কি লিলির সীমন্ত—কোথাও ছোঁয় না! ওদের এরূপ ব্যবহারে শিশির বিস্মিত হয় না একটুও।

গুলির উপদ্রব শেষ হলে, দুজনে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিকতা ফিরে পাবার পর লিলি বলে ঃ বুঝেচ দাদা, সেই বেড়ালটাই নষ্টের গোড়া! সেই তো আমাদের ধরিয়ে দিলে! প্যাকিং বাক্সগুলোও ফেললে ওই তো।

হুঁ, এখন আমার বোধ হচ্ছে বেড়ালটা খুব সুবিধের ছিল না! শিশির মাথা নাড়ে ঃ আসলে বেড়ালই ছিল না কে জানে!

তোমার কি ধারণা তাহলে কোনো ডিটেকটিভ? পুনরায় ওদের পুরোনো সন্দেহোদ্রেক ঃ ছদ্মবেশী গোয়েন্দা কোনো?

আমার তাই বিশ্বাস। আমি প্ল্যানটায় হাত দেবার সাথে সাথে ও লাফ মেরেছিল। এখন আমার বেশ মনে পড়ছে।

আমাকে এমন একটা ল্যাজের ঝাপটা লাগাল যে—! লিলি নিজের নাকে হাত বুলায় ঃ যদিও ওটা ওর সত্যিকার ল্যাজ নয় নিশ্চয়। অনেকটা পরচুলার মতো পরল্যাজের ব্যাপার যদিও, কিন্তু তবু ভাবতেই এখনো আমার গা শিরশির করচে!

ও লোকটা একটা পাকা ডিটেকটিভ! উঃ, কীরকম নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়েছে! আর কী তীব্র লক্ষ! আমার কার্যকলাপের উপর কীরকম আশ্চর্য নজর রেখেছিল। দেখেছিলি? এ রকম প্রায় দেখা যায় না। ভাবতেও পারা যায় না। শিশির বলে ঃ কিন্তু ডিটেকটিভ হলেও ওদের দিকের ডিটেকটিভ—ডিটেকটিভের উপরে ডিটেকটিভ।

এমন সময় দূরে ঃ ভৌ—ভৌ—ভৌ—ঔ-ঔ-ঔ-ঔ-ঔ—! একাধিক কুকুরের সমবেত ঐকতান এক সাথে শোনা গেল।

শিশির ব্যস্ত হয়ে ওঠে ঃ দৌড় দৌড়! ডালকুত্তাদের ছেড়ে দিয়েছে, দেখছিস কী! গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমাদের পিছু পিছু ওরা ছুটে আসবে। হাতে পাবা মাত্রই ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলবে আমাদের। —ভারী ভয়ানক এইসব ডালকুত্তারা!

এবং বলতে না বলতে—

১০
শিশিরের লম্ফঝম্ফ

এবং বলতে না বলতে—

ভৌ—ভৌ—ভো ভো ভৌ—ভো-ও-ও-ও-ও-ঔ।

সেই ডালকুত্তার দল ভয়ানক হৈ চৈ করে এগিয়ে আসতে লাগল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশির আর লিলির আবার ভোঁ-দৌড়!

জানিস লিলি, যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কুকুর নাকি কামড়ায় না। দৌড়তে দৌড়তেই শিশির জানায়।

লিলি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না।

এসব ডালকুত্তারা কামড়াবে কিনা কে জানে! শিশির বলে।

দৌড়তে দৌড়তেই সন্দেহটা ব্যক্ত করে, দাঁড়িয়ে পরখ করে দেখার তার সাহস হয় না।

ঢালুর থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেছে, সেই জন্যে আপাতদৃষ্টিতে যতটা মনোরম আর সন্নিকট বলে মনে হয় আসলে বাড়িটা তত কাছাকাছি নয়।

উপত্যকা উতরে, চড়াই বেয়ে ওরা বাড়ির নিকটে গিয়ে পৌঁছায়, সটান ভেতরে গিয়ে চড়াও হয়ে। কিন্তু বাড়ির কোথাও এতটুকু টুঁ শব্দ নেই, জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না।

পা টিপেটিপে ওরা এগিয়ে যায়। একটু ভয়ে ভয়েই এগোয়!

সামনের ঘরটা থেকে হঠাৎ চাপা গলার ফিসফাস ওদের কানে আসে : পিস্তলগুলোয় গুলি ভরে নিয়েছ তো?

পিস্তলের কথা কানে যেতেই তার একটা গুলি যেন ছিটকে এসে ওদের মর্মস্থল বিদ্ধ করে। অ্যাঁ? এখানেও পিস্তল? সেই পিস্তল আবার এখানেও? ছাগলের রাজধানী পার হয়ে এসেও ফের পিস্তল?—

একটা আধবোজা জানলার ধার ঘেঁষে ওরা দাঁড়ায়। দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। গরাদের ফাঁক দিয়ে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বাড়িয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মেরে দ্যাখে, চৌকোনা একটা টেবিল ঘিরে জন পাঁচেক ভীষণ চেহারার মানুষ, টেবিলের উপর ছড়ানো কী একটা কাগজের উপরে ব্যগ্র হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সেই পঞ্চ-পাণ্ডবের একজনকে দর্শন মাত্রই চেনা যায়, তিনি হচ্ছেন আর কেউ না, তাদের সেই গ্র্যান্ড মামা!—

কুকুরদের মধ্যে যারা বাকপটু, বিবৃতি দিতে বিশারদ, কামড়াবার তাদের উৎসাহ কম, একথা অনেকদিনকার জানা কথা। কিন্তু সে কথা কাজের কথা কিনা, রচনার খাতায় ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগানো যায় কিনা, এক সঙ্কটাপন্ন সুযোগে পরীক্ষা করে দেখতে তাদের ভরসা হয় না।

এরাও, এই সব কুকুররাও বক্তৃতা ছড়াতে ছড়াতে ইস্তাহার বিলি করতে করতেই আসছে বটে কিন্তু এদের মুখের কথায় কি আস্থা স্থাপন করা যায়? এরা যদি ততটা ভদ্রলোক না হয়?

তুই কী বলিস লিলি? এই সব কুকুরদের—?

এদের অভিভাষণে বিশ্বাস করা যায় কী যায় না, এই কথাটাই শিশির জানতে চায়।

লিলি কিছুই বলে না, বলবার তার শক্তিই নেই কিংবা এবিষয়ে বলা বাহুল্যমাত্র, এই হয়তো তার বক্তব্য। সে আরো জোরে জোরে পা চালাবার চেষ্টা করে, যা বলবার, মুখে না বলে পায়ের সম্মুখেই ব্যক্ত করতে চায় বোধহয়।

উঁহু, যেরকম ধারা চেঁচাচ্ছে, এরা যেন কামড়ে দেবে বলে মনে হয়। এসব ডালকুত্তাদের কাছে ডাল গলানো যাবে না। লিলির মতের অপেক্ষা না রেখেই শিশির নিজের অনাস্থা জ্ঞাপন করে।

আর কামড়াতে আরম্ভ করলে—শুরু করলে একবার—বাব-বাঃ—

সেই ভয়াবহতা শিশির ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারে না, তার মানসনেত্রের সামনে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়, তার প্রতি পদক্ষেপে, দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখে, সেই একান্ত আসন্ন দুর্ঘটনা সিনেমা ফিলমের মতো দৃশ্যের পর দৃশ্যে উদ্ঘাটিত হয়ে প্রকট হতে থাকে।.....

এক ডজন বুভুক্ষু ডালকুত্তা খাই খাই করতে করতে তাদের দুজনের ঘাড়ে এসে পড়েছে—ছজন করে পার হেড—ভালো করে—খতিয়ে হিসেব করলে তিনজন করে পার লেগ—কেন না হাতের নাগালে পাওয়া মাত্রই ওরা পায়েই এসে কামড় বসাবে, পলায়নের যন্ত্রটাকেই ধ্বংস করবে সব আগে—পা থেকেই উদরস্থ করতে শুরু করবে। তারপর পা থেকে হাতে—হাত থেকে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! নাক কান চোখ মুখও তারা বাদ দেবে না, অবহেলা করবে না নিশ্চয়, তাদেরকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খুবলে খাবলে পেটের মধ্যে পাচার করে দেবে সন্দেহ নেই কিন্তু ওগুলো তারা খুব সম্ভব, শেষের দিকে, চাটনি কিংবা সন্দেশের মতো আস্তে আস্তে তারিয়ে তারিয়েই খাবে—ভোজনে প্রোগ্রামটা খাদ্যপরম্পরা এইভাবে অগ্রসর হয়ে পরিসমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছান উচিত, তবে আহার্যবস্তুর অগ্রপশ্চাৎ সম্বন্ধে ডালকুত্তাদের কতটা বাছবিচার, খাদ্যদ্রব্যের চর্ব চুষ্য লেহ্য পেয় বিভেদে কার প্রতি কীরূপ ব্যবহার করা বিধেয়—এই বিষয়ে কতখানি ওদের কর্তব্যজ্ঞান ও বোধশক্তি ওদের সুরুচি বা শৌখিনতারই বা কদ্দূর দৌড় তার কোনোই ধারণা শিশিরের নেই। হয়তো ওরা প্রথমেই এসে, উঁচু দেখে, শিশিরের নাসিকাতেই ঘেউ করে এক কামড়ে দেবে, প্রথম দর্শনেই সাবড়ে দেবে এক কামড়ে—ঠিক আচারের মতো তার প্রতি আচরণ করবে কিনা কে জানে।

কিন্তু কতক্ষণেরই বা ভাবনা? ওদের দুজনকে পিকনিক করে ফেলতে বারো জনার পক্ষে আর কতক্ষণ?

তারপর আহার সমাধা করে বিজয়গর্বে ওরা ফিরে যাবে—প্রত্যেকে এক একখানা হাড় মুখে করে—ওদের দুই ভাইবোনের ভগ্নাবশেষ! ওদের চোখে দীপ্ত চাহনি, এবং হয়তো বা মুখের কোণে একটু মুচকি হাসি!

তখন নিঃশব্দে ওরা ফিরে চলেছে—যদিচ তখনো ওদের মুখে বিবৃতি—সেই হাড়!

সিনেমার একেবারে সীমানায় এসে, The End কল্পনা করতেই শিশিরের রোমাঞ্চ হয়।

ডালকুত্তারা তখন খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে—তাদের হাঁকডাক প্রায় ওদের কান ধরে টান লাগাচ্ছে বলতে গেলে!

ভৌ—ভৌ—ভৌ!

সংস্কৃত ভাষায় ওর মানে দাঁড়ায়ঃ ভো ভো! ওহে—তোমরা! অত দৌড়চ্চ কেন? আরে শোনো শোনো! একটু দাঁড়িয়ে যেতে কী হয়?

শিশিরের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে তড়াক করে এক লাফ মারে—

নিজে লাফিয়ে উঠে, তারপরে লিলিকে টেনে তুলে নেয়।

১১
কুকুর আর মুকুর

উঁচু রোয়াক-ওয়ালা ছোট্ট একখানি ঘর। তাদের জন্যেই পথের ধারে অপেক্ষা করছিল যেন! একখানিই মাত্র ঘর, গৃহস্বামী কেউ নেই, হয়তো কোনো কাজেই কোথাও বেরিয়ে থাকবেন—তা যেখানে খুশি তিনি যান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার শিশিরদের কোনো অত্যাবশ্যকতা ছিল না। অন্তত তদ্দণ্ডেই ছিল না।

উঁচু রোয়াকটা দেখবা মাত্রেই শিশির লাফিয়ে উঠেচে। এক লাফে আগে নিজে উঠে, তারপর লিলিকেও সে টেনে তুলে নিয়েছে।

উঃ! বাঁচা গেল এতক্ষণে। ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দেয়া যাক এবার। দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে পদার্পণ করতে করতে সে বলে।

লিলি শুধু বলে ঃ উঃ! সে দম ছাড়ছে তখন।

অবশ্যি, বাঁচা যেতই! মারা যেতুম না অবশ্যি। হাঁপ ছেড়ে শিশির জানায় আমরা যে মারা যাবার নই তা আমি জানতুম! কেবল কী করে যে বাঁচব এইটেই আমার জানা ছিল না।

তুমি বলো না দাদা? লিলি বিস্মিত না হয়ে পারে না। তুমি জানতে?

বাঃ, আমরা কখনো মরতে পারি? এত সহজে মারা যাব বলিস কী? কেন, বন্দুকের ব্যবহারে তুই কী বুঝলি—কানের আশপাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে সব চলে গেল না? কুকুরের পেটের ভেতর দিয়ে আমাদের গন্তব্য পথ, এ কখনো ভাবতে পারা যায়? শিশিরের ততোধিক বিস্ময় হয় ঃ কোনো অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে এরকম পড়েছিস নাকি? বইয়ের বীরবররা কখনো মারা পড়ে?

ওঃ, তাই বল! এতক্ষণে লিলির কাছে বক্তব্যটা বিশদ হয় ঃ কিন্তু এখনো আমাদের বেঁচে উঠতে দেরি আছে দাদা! ডালকুত্তারা এসে পড়ল বলে! তুমি ভাবচ দরজায় খিল এঁটে বাঁচবে? যদি খিল ভেঙে ঢুকে পড়ে? ওরা অতগুলো আর আমরা দুজন! ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে কি আমরা পারব?

এই যে! হঠাৎ শিশির চেঁচিয়ে ওঠে ঃ ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা আয়না রয়েছে দেখচি যে! চেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে এবার সে লাফাতে শুরু করে দ্যায় ঃ আর আমাদের পায় কে?

আয় দুজনে মিলে এটাকে ধরাধরি করে দোরের বাইরে রেখে দিয়ে তারপর ভেতর থেকে খিল এঁটে দি! শিশির বাতলায় ঃ তারপর মজা দেখিস! কী মজা!

দুজনে মিলে সেই লম্বা চওড়া আয়নাটাকে পাঁজাকোলা করে বাইরে এনে ওরা স্থাপিত করে—লম্বা আয়নাটাকে চওড়া করে দেয়াল ঠেস দিয়ে রাখে দরজার ঠিক সমুখটাতেই। তারপর ভেতরে ঢুকে খিল এঁটে দিয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে নিঃশব্দে ডালকুত্তাদের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা এসে পড়ে। হৈ হৈ করে সব এসে যায়।

ভৌ—ভৌ—ভো—ভো—ভৌ—। (সাদা বাংলায় ওর মানে, সব ভোঁ ভোঁ দেখছি যে। এর মধ্যেই ওরা সটকাল কোথায়?)

প্রশ্নপত্র মুখে করেই, ওরা রোয়াকের উপর টকাটক লাফিয়ে উঠল এবং উঠবামাত্রই ওদের চক্ষুস্থির! ওদের প্রশ্নের যে এতবড়ো প্রত্যুত্তর ওখানেই অপেক্ষা করে রয়েছে তা ওরা ভাবতেই পারেনি। অ্যাঁ একীরে বাবা, ওদেরই সগোত্র আর একপাল ডালকুত্তা মহড়া নিয়ে দরজা আগলাচ্ছে দেখা যায়।

ওদের পিলে চমকে গেল, জয়ধ্বনি সেই সঙ্গে থমকে গেল।

কেবল ওই পালের মধ্যে যে মোড়ল গোছের, তার গলা দিয়ে বেসুরো এক আওয়াজ গলে এল ঃ ও-ও-ও-য়্যা-য়্যা-য়্যা—?

অর্থাৎ কিনা, এ আবার কী হ্যা? এরা কারা হ্যা?

দু-ভাই বোনে খড়খড়ির ছোট্ট ফাঁক দিয়ে দেখছিল সব—শিশির লিলির কানের গোড়ায় ফিসফিস করে ঃ দেখলি তো! দেখছিস তো! আর সে ঝাঁউ ঝাঁউ নেই! একেবারে মিউ মিউ। মিউ মিউ না হলেও ভ্যা-ভ্যা ডাক বেরিয়ে গেছে!

হুঁ-উ-উ। লিলি এক সুরে সায় দ্যায়।

ওদের মধ্যে দার্শনিক কেউ থাকলে এই সময় এদের আসল নকল সমঝে দিয়ে ঠিক পথ বাতলে দিতে পারত!

ঠিক পথ তো আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়া?

তা সে যাই হোক! দার্শনিকের কাজ হচ্ছে নিজের চোখ চালানো, পরের ঘাড় বাঁচানো তো নয়। শিশির জবাব দেয়।

কুকুরদের ঘাবড়ে যাবার কথাই বই কি! নিজের আশেপাশে ওরা প্রত্যেকে মাত্র দুজনকে দেখতে পাচ্ছিল,—কিন্তু সামনে একেবারে অগণন—সে যে কতগুলো ওদের আঙুলের ডগায় গোনা যায় না! অঙ্কের ভয়ে বা অন্য কোনো আতঙ্কে ওদের লেজ আপনা থেকেই নেমে এল।

এবং কী আশ্চর্য, প্রতিপক্ষেরা দলে বলে ভারী হয়েও, নিজেদের পতাকা নামিয়ে ফেলল। ওরাও তাহলে ভয় পেয়েছে—ওধারের ওরাও! এতক্ষণে এদের প্রাণে আবার সাহস ফিরল, আবার এধারের জয়পতাকা খাড়া হতে লাগল একে একে।

অন্য পক্ষের পুনরায় লাঙ্গুল উঁচানো দেখে এবার এরা চটে গেল। অ্যাঁ, একি রসিকতা নাকি! নতুন সাহসে, নবোদ্যমে, এরা ওদের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল এবার। এবং সেকি ঘোরতর লড়াই! আঁচড়া আঁচড়ি চেঁচামেচি—কামড়া-কামড়ি—আয়নার উপর সেকি ভয়ঙ্কর বায়না! এবং বলা বাহুল্য, আয়নার পক্ষও যুদ্ধ করতে কিছুমাত্র কসুর করল না!

খানিকক্ষণ সংগ্রামের পর ডালকুত্তারা কাতর হয়ে জিভ বার করে ফেললে। অপর পক্ষেরও সেই দুর্দশা দেখা গেল। পরস্পরের একই হাল দেখে এবার পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগল ওদের। সাময়িক সন্ধি ঘোষণা করে, উভয় পক্ষের সামরিক ক্ষতির ক্ষতিয়ান নেয়া শুরু হল তখন। দু দুলের মধ্যে মোটামুটি আলাপ আরম্ভ হল। আয়নারূপ দোভাষীর মধ্যবর্তীতায় সেটাকে প্রথম শান্তি-বৈঠক বলা চলে।

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর! লিলি এতক্ষণে কথা বলে। একটি প্রবচন দান করে এতক্ষণে।

মুগুর? মুগুর কিরে, মুকুর বল! যেমন কুকুর তেমনি মুকুর। মুকুর মানে আয়না জানিস না?

কথাটা মুকুর নাকি? আমি জানতাম মুগুর! লিলি নিজের এতদিনের অজ্ঞতায় একটু অবাক হয়।

আরে মুগুরই তো! মুগুর আর মুকুর তো এক! আয়নায় নিজেকে দেখতে মিষ্টি লাগে না! গুড়ের মতো—ঠিক মুগুড়ের মতো মিষ্টি লাগে না কী? গুড় আর মুগুর ,কি আলাদা? শিশির ব্যাখ্যা করে দ্যায়।

এই বিপদের মাঝখানেও লিলির মুখে হাসি খেলে যায়। সে বলে ঃ ঠিক দাদা! এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিয়ে ভাবে হায়, সামনে একটা আয়না নেই যে এক ফাঁকে নিজেকে একটু দেখে নেয় এখন।

কিন্তু ভারী দুর্লক্ষণ! দেখেছিস! মুখ শুঁকাশুঁকি করে ওরা একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাইছে! কনফারেন্স বসে গেছে দেখছিস না? এধারের জানলা টপকে এইবেলা এখান থেকে পালাই চ। শিশির বলে—ওর মুখে কোনো হাসি নেই।

১২
গন্ধ থেকে গন্ধমাদন

পেছনের জানলাটা আবার বহুদিনের অব্যবহারে এমন জং ধরা যে সহজে খুলতে চায় না! ছিটকিনিটাকে হটাতেই শিশির কাবু হয়ে পড়ল। কিন্তু হাতে ধরে সাধাসাধি করলে অটলকেও টলতে হয়, সামান্য ছিটকিনি আর কতক্ষণ? খানিক পরে সেটা খটাৎ করে সরে গেল হঠাৎ।

শিশির টপকাল আগে। তারপর লিলির পালা। লিলি যদি বা কোনো রকমে জানলার উপরে নিজেকে খাড়া করতে পারল, নামতে আর পারে না।

আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়! শিশির আবাহন জানায়, পড় না!

লিলি খুব ভরসা পায় না। তার পতনবেগে, বীরোচিত তার ছোট্ট দাদাটি দাঁড়াতে পারবে কিনা তার সন্দেহ হয়।

ভয় কী? আমি তোকে ধরব। শিশিরের নিরুদ্বেগ আহ্বান।

লিলি একটা পা বাড়িয়ে দ্যায়। কিন্তু আরেকটা পাকে কিছুতেই আর নামাতে পারে না। মূল্যবান মুহূর্ত সব অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, লিলির পায়ের পাশ দিয়ে কালস্রোত কলকল বেগে বয়ে যাচ্ছে, শিশিরের আর তর সয় না, পা ধরে হ্যাঁচকা টান লাগায়।

লিলি নেমে আসে, টানের সেই বিপাকে নির্বিঘ্নে পদচ্যুত হয়ে নিরাপদেই ধরাতলে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তার ফ্রকের খানিকটা ছিন্ন হয়ে পশ্চাদবর্তী ছিটকিনিতে আটকে থেকে যায়।

"থাক গে। শিশির ফ্রকের উপসংহারের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে বলে ঃ আমাদের জয়পতাকার মতো উড়তে থাক।"

"পরাজয়ের নিশান বলো বরং! লিলি বলতে চায়। কেবল অসত্য বলেই জয় ঘোষণায় তার দ্বিধা নয়, ফ্রকের অসভ্যতায় সে বেশ চটে গেছে।"

"পরাজয় কীসের? কেন, আমরা কি অ্যাকর্ডিং টু দি প্ল্যান পালাচ্ছি নে? ঠিক যেমন করে পালানো উচিত, পালাতে পারচি নে কি? শিশির গর্বিত না হয়ে পারে না।"

তা পালাচ্ছি বটে! কুকুরের সামনে শেয়ালের মতো পালাচ্ছি বটে। লিলি বলে।

উঁহু। মোটেই তা নয়। পালানোটা সিংহের মতো কাজ। পলায়নের শেষের দিকে লায়ন। লায়নে আর পলায়নে একেবারে জড়াজড়ি।

এই বলে, উদাহরণস্বরূপই যেন সে আবার দৌড়তে শুরু করে দ্যায়। লিলি আর প্রতিবাদ করতে পারে না, তাকে দাদার পিছু নিতে হয়।

বন্দুকগুলো তবু মানুষের মতো ছিল! এই ডালকুত্তারা মোটেই তা নয়! দৌড়তে দৌড়তে শিশির বলে।

লিলি শুধু বলে—উঃ! এতদ্বারা আপত্তি বা সম্মতি কী জানায় বলা কঠিন।

গুলিগুলিও ভদ্রলোক! ওদের কর্তব্য ওরা করেছে। ওদের আর কাজ কী? কানের

আশপাশ দিয়ে সোঁসোঁ করে বেরিয়ে যাওয়া। তা ওরা চোঁচোঁ বেরিয়ে গেছে, স্পর্শও করেনি আমাদের।

লিলি কোনো সাড়া দেয় না।

আমরাও আমাদের কর্তব্য করেছি। ওরাও যেমন আমাদের গায়ে হাত দেয়নি, আমরাও তেমনি বন্দুকের সামনে অম্লানবদনে বুক পেতে দিয়েছি। বুক অথবা পিঠ। আমরা তার কি কোনো অন্যথা করছি?

লিলি জবাব দিতে পারে না, শিশির যেমন পা আর মুখ, এক সাথে, খরতর বেগে চালাতে পারে, ওর পক্ষে তা অসাধ্য। পায়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু তার কান চলে। পা আর কান, পাল্লা দিয়ে, একসঙ্গে চালানো যায়।

গুলির সামনে বুক পাততে আর কী? কী আর এমন কান পাতলেই হয়। সোঁসোঁ করে চলে যাবে তাই কেবল শোনো। ভয়ের কিছু নেই। শিশির নিজের অভিজ্ঞতার বিজ্ঞপ্তি দ্যায়! কিন্তু এই ডালকুত্তারা! বাব্‌বা! একবার এরা হাতে পেলে আর রক্ষে আছে? সঙ্গে সঙ্গে দাঁত বসাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘাত—!

নির্ঘাত সাবাড়, বক্তব্যের এই কথাটা, সংবাদের শোচনীয় অংশটুকু বোনের মুখ চেয়ে শিশির উহ্য রাখতে চায়। লিলি এবার ঘাড় নেড়ে—যে ঘাড়টা দৌড়োনোর তালে তালে আপনা থেকেই নড়েছিল তার সাহায্যে—দাদার কথায় সায় দেবার চেষ্টা করে। হতাহতের তালিকায় তার স্থান যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে একথা তার অজানা নয় ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়।

ডালকুত্তারা এধারে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শেষ করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের মুখেই একটা ধাক্কা খেয়েছে! প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্মুখ আলাপে অগ্রসর হতে দ্বিধা করেনি, অম্লানবদনেই মুখ বাড়িয়েছিল, ওদের সঙ্গে সঙ্গেই বলতে কি। কিন্তু তথাপি সে আলাপের কেবল মৌখিকতাই সার! এতখানি সম্মুখীনতা সত্ত্বেও তার মধ্যে কী যেন কোমলতা নেই, কেমন যেন জিনিসটা মিষ্টি নয়। ভাবের মধ্যে কীসের যেন অভাব।

আয়নায় মুখ শোঁকা-শুঁকি করতে গিয়ে মুখ ঠোকা-ঠুকি করে, পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে, হতাশ হয়ে পুনরায় যখন নিজেদের পরামর্শ বৈঠকে ফিরে এসেছে, তখন ওদের মধ্যে একজনের, অপেক্ষাকৃত ভুয়োদর্শী জনেকের মনে সন্দেহ জেগে উঠল—সমস্ত জিনিসটাই ভুয়ো নয় তো? স্রেফ আরেকখানা ভুয়োদর্শন নয় তো?

ঘাড় বেঁকিয়ে তথাকথিত শত্রুদের দিকে সে একটা বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছে। তারপর মাথা নেড়ে আপন মনেই বলেছে, "হুঁ! সব মায়া। সমস্তই অসার! সবই ভগবানের লীলা! কিসুই কিসসু নয়! তাহলে—তাহলে, তাহলে আর বৃথা মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?

ভাবতে ভাবতে তার মনে হল, ওধারে খট করে একটু আগে একটা আওয়াজ হয়েছিল না? তার মনে খটকা লাগল কেমন!

এটাকে যেমন চোখের ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে সেও কি তেমনি কানের ভ্রম ছাড়া কিছু নয়?

যদি তাই হয়, তাহলেও সেই ভ্রমকে অনুসরণ করে—ঈষৎ লম্বা করে! পায়ের দিকে বাড়িয়ে একটু ভ্রমণ করে দেখতে ক্ষতি কী! কিঞ্চিত ঘুরফির করে দেখাই যাক না!

সেই ভুয়োদর্শীই সবার আগে একলা আবিষ্কার-যাত্রী হয়ে বেরিয়ে, খোলা জানলার পাশে পতপত রবে উড্ডীয়মান সেই জয়পতাকা দেখতে পেল!

এবং সেই জয়পতাকার সঙ্গে জড়ানো, পলাতকদের সৌরভ!

আবিষ্কারের মতন একখানা আবিষ্কার! অমনি সে বাঙ্ময় হয়ে উঠে প্রত্যাদেশের মতো একটা আদেশ ছেড়েচে! হৈ-চৈকরে হাঁক-ডাক ছেড়ে সবাইকে একজোট করে ফ্যালে। ডালকুত্তাদের এমনি, একবার একটু গন্ধ পেলেই হল! পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অমনি সেই গন্ধকে তাড়া করে তারা দৌড় লাগাবে।

এক্ষেত্রেও শিশির-লিলির পশ্চাদ্ধাবনে তাদের বিলম্ব হয় না!

শিশিররা লম্বা লম্বা পা ফেলে বেশ খানিকটা আগিয়ে গেছল, কুকুরে আর মুকুরে জড়াজড়ি করে একত্র হয়ে বেশ জব্দ হয়ে রয়েছে ভেবে খানিকটা নির্ভাবনাও যে না হয়েছিল তা নয়, এমন সময়ে আবার সেই চতুষ্পদী পয়ারে 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ' না শুনে, পেছনে না তাকিয়েই কারা পেছু নিয়েছে অনুমান করতে তাদের দেরি হয় না।

কিন্তু এবার? এবার কী? সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায়, খোলা বাড়ি দূরে থাক, একটা খোলার বাড়িও চোখে পড়ে না। চারধারেই ধূ ধূ মাঠ! কদ্দূর দৌড়িয়ে কোথায় গিয়ে তারা রক্ষা পাবে?

আর কি তাহলে পরিত্রাণ নেই? এইখানেই শেষ? 'দি এন্ড?' কোনো অ্যাডভেঞ্চারের গল্পেই যা ঘটে না, কদাচ ঘটেনি, অন্তত তাদের পড়াশোনার মধ্যে মনে পড়ে না, মৌলমীনের এই পরিত্যক্ত প্রান্তরে সেই অঘটন—সেই অঘটনীয় দুর্ঘটনা—সেই মৌলিক এবং অত্যন্ত মীন ব্যাপার—একান্তই ঘটে যাবে?

বন্দুকের হাতে বেঁচে—গুলিদের থেকে পদে পদে খুলি বাঁচিয়ে—ডালকুত্তাদের হাতেই ঘায়েল হতে হবে শেষটায়?

শিশির আর লিলি প্রাণপণে দৌড়াতে থাকে। ডালকুত্তারাও ছেড়ে কথা বলে না—তারাও দৌড়ায়। অচিরেই তারা কাছাকাছি এসে পড়ে।

প্রায় তিনশো গজের মধ্যে পৌঁছে যায়। তারপরে লম্বা লম্বা লম্ফ-ক্ষেপে ক্রমশই ব্যবধান কমে আসতে থাকে। .....আড়াইশো গজ.....দুশো তেতাল্লিশ..... একশো বিরাশী.....একশো চৌত্রিশ.....অন্তরায় কমে কমে অবশেষে একশো এগারোয় এসে দাঁড়ায়। এবং সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে না, আসতে আসতে (আস্তে আস্তে নয়)— একেবারে নিরানব্বইয়ের ধাক্কায় এসে পৌঁছায়।

নিরানব্বই থেকে অষ্ট-আশি, ডালকুত্তাদের পক্ষে এমন কিছু কষ্টকর নয়। অষ্ট-আশি থেকে সাতাত্তর.....সাতাত্তর থেকে সাঁইত্রিশ! সাঁই সাঁই ব্যাপার!

ভৌ ভৌ ক্রমশই আরো ভয়াল হয়ে আগিয়ে আসে, কানের তালিতে এসে তালা লাগিয়ে দেয়।

এমন সময়ে—

এমন সময়ে সেই ছাগলের পাল—

অনেকক্ষণ আগে যারা ওধারে গেছল, তারা ওধারের চর্বণ সেরে, এধারে বিচরণ করতে ফিরছে—ওধারের ভোজনপর্ব নিকেশ করে এধারের চর্ব্যচুষ্যে চড়াও হওয়ার মতলবেই তারা আসছিল।

লিলি! লিলি! চটপট! ওই ছাগলদের আসবার আগেই! খুব ছোট! যেমন করে হোক ছাগলদের ওধারে গিয়ে পড়তে হবে। রুদ্ধ নিশ্বাসে শিশির চিৎকার ছাড়ে।

লিলি পারে না, তবু সে শেষবার মরিয়া হবার চেষ্টা করে। এমনিতেই সে দাদার থেকে তেরো হাত পিছিয়ে পড়েছিল, কুকুরদের সাড়ে ছ গজ কাছিয়ে গেছল—কিন্তু তার পা আর উঠতে চায় না। শিশির নিজের গতি মন্দ করে লিলিকে আগিয়ে নিয়ে আসে, তারপরে তার হাত ধরে টান মেরে এক সাথে দৌড় লাগায়।

একটু আগে যে পাথরখানার উপরে ভটস্থ হয়ে তারা ছাগস্রোত নিবারণ করেছিল, একটু পরে সেই পাথরখানার উপরেই তারা হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ে।

আর তার পরমুহূর্তেই সেই ছাগলের পাল উল্কাবেগে ব্যা-ব্যা করতে করতে এসে পড়ে। সেই বিরাট শোভাযাত্রা অফুরন্ত উৎসাহে রাস্তা পারাপার করতে থাকে।

ডালকুত্তারা সেই ছাগলাৎ সমারোহের সামনে এসে হকচকিয়ে থেমে যায়। কী করবে ভেবে পায় না, ওদের ভেদ করে এগোবার কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

শিশির-লিলি সেই পাথরের উপরে দণ্ডায়মান হয়ে দ্যাখে—ছাগলদের—ছাগলদের পরপারে কুকুরদের—

কুকুররাও যে তাদের দেখতে পায় না তা নয়।

লিলি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে ঃ কতক্ষণ আর! ছাগলরাও চলে যাবে, ওরাও এসে আমাদের ছিঁড়ে খাবে।

হ্যাঁ, খেলেই হল! শিশির, তার নির্ভীকতায় ফিরে এসেছে আবার! খেলেই হল আর কী!

কেন, খাবে না কেন? আমি আর দৌড়তে পারব না দাদা! তা বলে দিচ্ছি। পা তুলতেই পারচি নে!

দরকার নেই আর পা তোলার। ঠায় দাঁড়িয়ে দ্যাখ। কুকুররা আমাদের টের পেলে তো!

কেন, টের পাবে না কেন? জলজ্যান্ত ওইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে! দাদার কথায় লিলি অবাক হয়ে যায়।

দেখলেই বা! দেখে ওরা কিচ্ছু বুঝতে পারে না, গন্ধ থেকেই টের পায়। আমাদের গন্ধ আর পেলে তো? এই বোকা পাঁঠারা যা গন্ধ ছড়িয়ে গেল! শিশির নাক সিঁটকোয়! রামোঃ! এ গন্ধ এখন এক শতাব্দী থাকবে! শিলঙ-এ ফিরেও এর সৌরভ পাব!

যমালয়ের দরজার প্রায় সামনে এসে প্রাণান্তকর প্রান্ত পর্যন্ত তারা এগিয়ে পড়েছে, এতক্ষণ লিলির এই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন দাদার কথায় গন্ধর্বলোক ঘুরে, সে আবার নতুন করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। দারুণ দুর্গন্ধ নাক ভরে পান করে সে পুনঃ পুনঃ আরামের নিশ্বাস ছাড়ে—আঃ! বাস্তবিক, এমন মিষ্টি গন্ধ, এহেন সৌরভ, কোনো মূল্যবান এসেন্সের মধ্যেও সে এতদিন পায়নি।

শিশিরের আন্দাজই ঠিক! পাঁঠারা চলে যাবার পর ডালকুত্তারা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল! কোন দিকে যে যাবে, কার গন্ধের ছুতো ধরবে—সে-এক ভারী সমস্যায় পড়ে গেল তারা। শিশিরদের কাছেও এল না যে তা নয়—সন্দিগ্ধভাবে দেখল খানিক, শুঁকেও দেখল কয়েকবার, কিন্তু নাসিকার সাহায্য নিয়েও, পাঁঠাদের সগোত্র ছাড়া আর কিছুতেই তাদের ভাবতে পারা গেল না।

উঁহু, যা ভাবছ তো নয়! আমরা তারা নই, সেই পলাতকরা আমরা নই। লিলি বলে, নিজের মনে মনেই বলে—উচ্চারণ করে বলার তার সাহস হয় না।

হে পাঁঠারা! তোমরাই ধন্য! নিজের মহিমান্বিত আমাদের মহিমান্বিত করে—নিজেদের সৌরভে আমাদের সুরভিত করেই কেবল তোমরা যাওনি, আমাদের সাথে সাথে এই দুর্দান্ত ডালকুত্তাদেরও পাঁঠা বানিয়ে গেছ! শিশিরের সারা মন পাঁঠাদের লীলার মহিমা গানে মুখর হয়ে ওঠে।

ভৌ ভৌ? এরা কারা? এই দুটো উদ্‌বেড়াল যারা দাঁড়িয়ে আছে—এরা কি তারা? তাদের মতোই বটে কিন্তু তারা তো নয়! এরা কারা তবে? ভৌ—ঔ—ও-ও-ঔ?

ডালকুত্তারা নিজেদের মধ্যে মুখ শোঁকা-শুঁকি করে।

এই! এই! পাঁঠার ডাক ছাড়! শিশির বলে ওঠে ঃ শিগগির। দেখছিস কি?

ব্যা—ব্যা—ব্যা—! লিলি ডাকাডাকি লাগায়।

শিশির বলে ঃ অররররররর.....

গন্ধে মেলা সত্বেও শিশিরদের আকারে-প্রকারে যাও বা ওদের সন্দেহোদ্রেক হয়েছিল, ছাগল বলে স্বীকার করতে দ্বিধা হচ্ছিল, এখন লিলির ব্যা-করণে আর শিশিরের সংস্কৃত ভাষায়, ভাষার সাথে ব্যাকরণের নিখুঁত মিলন দেখে তা তিরবেগে তিরোহিত হয়ে গেল। মানুষের হাবভাবে ওরা যে পাঁঠাদের পাঠান্তর ছাড়া কিছু নয়, এ বিষয়ে একমত হতে ওদের আর বাধারইল না?

এবং তারপরেই নিজেদের ভোট শিশিরদের বিপক্ষে দিয়ে একে একে তারা লাঙ্গল প্রদর্শন করতে লাগল। কুরুক্ষেত্র থেকে, কিছু না করেই, পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে ফিরে চলল।

এখন আর ওদের সে লম্ফ-ঝম্ফ নেই! সে উৎসাহ যেন কোথায় উপে গেছে! টুঁ শব্দটি নেই কারো! ধীর পদক্ষেপে নীরবে অধোবদনে ওরা ফিরে চলেছে!

সবাই মুখটি বুজে চুপটি করে চলেছে! দেখেছ দাদা, ডালকুত্তাদের, কারো মুখে কোনো রা নেই! লিলি বলে।

কর্তার কাছে কী কৈফিয়ত—কী জবাবদিহি দেবে—সেই কথাই ওরা ভাবছে—মনে মনে তারই প্ল্যান ভাঁজছে এখন। কে জানে আজ হয়তো ব্যাটাদের ডাল-রুটি বন্ধ।

এবার শিশির হাসে! এতক্ষণে ওর হাসি পায়।

১৩
হাতের স্বর্গ না বিসর্গ

এই নাও। শিশির গিয়ে তার মামার হাতে প্ল্যানটা ছাড়ল!

মামা বিস্মিত হয়ে উঠলেন, আর পরমুহূর্তেই তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা গেল। কিন্তু তাঁর মনোভাবের আভাস ভাষায় প্রকাশ করার জন্যে এক মুহূর্তও না নষ্ট করে, একটুও না দাঁড়িয়ে, প্ল্যানটি পাবামাত্রই বিদ্যুৎগতিতে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

যেমন তড়িৎ-বেগে তিনি গেলেন, খানিক পরে, তার চেয়েও, এমন কী, ততোধিক ত্বরিত বেগে ফিরে এলেন তিনি।

কিছু নেই, কিছু নেই! তাঁর মেঘলা মুখমণ্ডল থেকে যেন দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড় বয়ে গেল!

কিছু নেই, সে কী মামা? লিলিও খুব তাক লাগে।

নাঃ, সব সেই হতভাগা মামাটা নিয়ে সটকেছে। এর আগেই সটকান দিয়েছে। সেই কালনিমে অপয়াটা।

তা কী করে হবে? শিশির বিশ্বাস করতে পারে না ঃ এর মধ্যেই নিয়ে পালাবে কেমন করে? আমি তো গ্র্যান্ড মামাকে কাল রাত্রে কিছু নিতে দিইনি। চুইংগাম চালিয়েই তো তাকে ভাগালুম!

বাস্তবিক, কী করে তা সম্ভব হতে পারে? কালকের রাত্রে, ইতস্তত ভ্রষ্ট সেই সব নিক্ষিপ্তদের ঠেলায় বিরক্ত হয়ে—চুইংগামদের চাটুকারিতায় চটে গিয়ে, চটচটে হয়ে সেই যে তিনি তির বেগে প্রস্থান করেছেন তার পরে ফের কখন এলেন আবার? তারপরে সেই তো—এই শিশিরই তো—কত না বীরত্ব দেখিয়ে উক্ত প্ল্যান উদ্ধার করে এইমাত্র ফিরল!

দাও তো দেখি প্ল্যানটা আমায়! শিশির বললে ঃ দেখি আমি চেষ্টা করে। খুঁজে পেতে দেখা যাক একবার।

ব্রজেশ্বর বড়ুয়া অম্লান বদনে—কিংবা অতিশয় ম্লান বদনেই, প্ল্যানটি শিশিরের হাতে পরিত্যাগ করেন। যে-প্ল্যানের পেছনে কোনো গুপ্তধনের কিনারা নেই তা রেখে লাভ? যার সমস্তটাই ফাঁকা—বেবাক ফাঁকা—তা আর রাখা কেন?

নকশাটার-সর্বস্বত্ব লাভ করে উল্লসিত হয়ে শিশির সেই গুপ্তকক্ষে গিয়ে হাজির হয়। পার্চমেন্টের ছকটাকে অনুসরণ করে, এগিয়ে পেছিয়ে, ডান-ধারে বাঁ-ধারে এঁকে বেঁকে, দুবার লেফট আর চারবার রাইট টার্ন করে—রাইট কিংবা রংটার্ন তা কেবল সেই বক্কেশ্বরই জানেন—অবশেষে নকশার উপদেশ মতো, তিন পাক ঘুরে চিহ্নিত একস্থানে গিয়ে সে উপস্থিত হয়, এবং উপস্থিত হয়েই সে লাফাতে আরম্ভ করে (যদিও লাফাবার কোনো নির্দেশ সেই নকশার মধ্যে ছিল না)!—কিন্তু না লাফিয়ে সে করে কী,—একবারে হুবহু সেই চিহ্নই যে! নকশার নিশানার সঙ্গে অবিকল একেবারে! একটা শক্ত আঁক এমনভাবে মিলে গেলে না লাফিয়ে কি থাকা যায়?

দুয়ে দুয়ে যেমন চার হয়, (দুধও হয় নাকি, অনেকে বলে থাকেন) তেমনি অবলীলাক্রমে কত বড়ো একটা কাণ্ড হয়ে গেল!

তারপর নকশার আদেশমতো তিনটি টোকা—চারিটি নয়, দুটিও না—গুনে গুনে তিনটি টোকা—সেই চিহ্নটির পৃষ্ঠদেশে! আর তিনবার টোকবার পরেই—

ঠিক যেমনটি শিশিরের আশঙ্কা ছিল—

চকিতের মধ্যে, কোথ্থেকে কী সরে গিয়ে উন্মুক্ত আধারে, চক্‌চকে কত কী সব বেরিয়ে পড়ল!

হাঁসের ডিমের মতো—কিন্তু আকারে হয়তো বৃহত্তর—তেমনি সাদা আর তেমনি সুচারু—থরে বিথরে সাজানো কতকগুলি—

কী ওগুলি? হিরে না জহরত? মণি না মাণিক্য? মুক্তা না গজমতি? চুনী পান্না প্রবাল মরকত—কী ওরা? রত্নতত্ত্বে শিশির খুব ওয়াকিবহাল ছিল না—ও-বিষয়ে ওকে প্রায় বিশেষজ্ঞই বলা চলে—তবু, বিশেষ অজ্ঞতা থাকলেও, যাই হোক, ওগুলো যে খুব দামি চিজ সে সম্বন্ধে তার তিলমাত্র সন্দেহ রইল না।

একেকটি করে গুনে গুনে দেখল শিশির—তেরোটি।

সাত রাজার ধন এক মানিক—একমাত্র মানিকে সাত সাতটা রাজ্য কেনা যায়। কিন্তু এর একটায়—এহেন এক রাম-মাণিক্য দিয়ে কটা সম্রাটের কখানা সাম্রাজ্য কেনা যায় কে জানে!

বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে এই সব কথা শিশির ভাবছে—এমন সময় পেছন থেকে হেঁড়ে গলায় এক আওয়াজ এল ঃ হাত তোলো!

অ্যাঁ? চমকে গিয়ে শিশির পেছন ফিরল। পিস্তল হাতে তার গ্র্যান্ড মামা।

তুলে ফ্যালো! দেখছ কী আর? বক্কেশ্বর আইচ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেন।

কেন, হাত তুলব কেন? কী হয়েছে? শিশির বলে।

হাত তুলবে কেন, বলছ বেশ। বক্কেশ্বর কাষ্ঠহাসি হাসেন ঃ আমার হাতে এটা কী, দেখচ না?

দেখেচি। পিস্তল। তাচ্ছিল্যভরে শিশির জানায়।

হ্যাঁ, গুলিভরা ছ-নলা—দেখেচ ত? গ্র্যান্ডমামা আরো বিশদ করে দ্যান ঃ এরকম একখানা দেখলেই লক্ষ্মী ছেলের মতো হাত তুলতে হয়। গুলি করে দেব তা না হলে তা বলে রাখচি। হাত না তুললেই গুলি করার নিয়ম।

অগত্যা, শিশিরকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়মরক্ষা করতে হয়।

হুঁ, যে-বিয়েতে যে-মন্ত্র। যে কাজের যা-দস্তুর। ঊর্ধ্ববাহু দেখে প্রসন্ন হয়ে বক্কেশ্বর বিবৃতি দ্যান ঃ তুমিও যদি এমনি একখানা রিভলবার নিয়ে পেছন থেকে আসতে আর আমি তোমার অবস্থায় পড়তুম—আমিও হাত তুলে ফেলতুম। বলতে না বলতেই—হুঁ!

আমার রিভলবার কই? শিশির ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফ্যালে।

নেই তো—নেই তো! সেই জন্যেই তো আমি সুবিধে করে নিচ্ছি। এসব কাজে এগুতে হলে রিভলভার নিয়ে এগুতে হয়। তাও জান না?

এই বলে বক্কেশ্বর আইচ রিভলভার হাতে রত্নসম্ভারের দিকে গুটি গুটি অগ্রসর হন। ধীরে ধীরে এগুতে থাকেন। এগুতে এগুতে শিশিরের নাকে আর পিস্তলে ঠোকাঠুকি লাগে।

একী! দাঁড়িয়ে রইলে যে? পিছনে হটছ না কেন? পিছিয়ে যাও। পিছনে হটে পিস্তলের রেঞ্জের মধ্যে এসো। যাতে দরকার হলে তোমাকে আমি গুলি করতে পারি। নাকের উপর নল রেখে গুলি করা যায় না—তাতে পিস্তলের অপমান হয়।

শিশির তথাপি নড়ে না। পিস্তলের নলে আর তার গালে মোলাকাত হতে থাকে।

ছি ছি! ছবির মতো অমন দাঁড়িয়ে থেকো না, দোহাই তোমার! আমার কাজের বাধা হচ্ছে। অমন করলে, গুলি না দেগে এর বাঁট দিয়েই এক ঘা সাঁটিয়ে দেব। নাক ফেটে রক্ত পড়লে আমার দোষ নেই তখন। বক্কেশ্বর আইচের সতর্কবাণী শোনা যায়। পিছিয়ে যাও, ভালো কথাই বলছি! তিনি পুনঃ পুনঃ সাবধান করেন।

গুলিকে শিশির গ্রাহ্য করে না, কিন্তু নলাঘাতে তার ভয় আছে। অগত্যা একান্ত বাধ্য হয়েই, কয়েক পা তাকে পিছুতেই হয়।

বক্কেশ্বর রত্ন-ডিম্বগুলি নিরীক্ষণ করেন, সকৌতূহলে পর্যবেক্ষণ করেন সব। তারপরে, রুমালে বেঁধে ওগুলিকে করায়ত্ত করার তাঁর চেষ্টা হয়। কিন্তু এক হাতে তাদের পাকড়ানো যায় না কিছুতেই।

ইস! ভারী মুশকিল হল দেখছি! এই পিস্তলটাকে নিয়েই মুশকিল হল! কোথায় যে রাখি!

আমি ধরব? শিশির প্রস্তাব করে—বেশ, একটু সাগ্রহেই। পিস্তলটা আমি ধরব ততক্ষণ?

তুমি! তুমি ধরবে! তুমি ধরবে পিস্তল? বক্কেশ্বরের দু চোখ বিস্ময়ে কপালে গিয়ে ওঠে: তুমি যদি পিস্তল ধর তাহলে এই ডিমগুলো কি আর আমি ধারণ করতে পারব? পিস্তল যার, এগুলোও তার। বুঝেছ?

আর অধিক বাক্যব্যয় না করে তিনি ডিম্বগুলিকে গ্রেপ্তার করতে অগ্রসর হন।

হাত তুলে থাকতে পারছি না! ব্যথা করছে! শিশির দুঃখের সঙ্গে জানায়।

তাহলে এক কাজ কর। এগুলো আমার রুমালে বেঁধে ছেঁদে আমার পকেটে ভরে দাও।

গ্র্যান্ড মামার অনুজ্ঞায়, আর রিভলভারের অনুনয়ে, সেই গ্র্যান্ড রত্নগুলি শিশির রুমালের অন্তর্গত করে তাঁর পকেটস্থ করে দ্যায়।

নাও, এইবার এই প্ল্যানটা নিতে পার। নিয়ে যাও, খেলা করগে। আমার আর এতে প্রয়োজন নেই। ইচ্ছা করলে তোমার মামাকেও এটা দিতে পার—আমার সেই হতভাগা ভাগ্নেটাকে। তবু এখানা দেখলে খানিকটা শোক সামলাতে পারবে। অনেকে যেমন প্রিয়জন খোয়া গেলে তার ফটো দেখে সুখী হয়।

এই বলে গ্র্যান্ড মামা শ্রীযুক্ত বক্কেশ্বর আইচ, মৃদুমন্দ হাসির সঙ্গে মৃদুমন্থর গতি

মিলিয়ে, একেবারে গদ্য কবিতার মতো মিলিয়ে দিয়ে, গদগদভাবে হেলতে দুলতে চলে যান।

১৪
বিসর্গ থেকে অনুস্বর

শিশির এক ছুটে সেই গুপ্ত কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে। মামা ব্রজেশ্বর বড়ুয়া পেছন থেকে ডাক ছাড়েন, কীরে পেলি কিছু?—কিন্তু শিশির আর ক্ষণমাত্র দাঁড়ায় না।

কাছেই একটা সাইকেলের দোকান সে দেখছিল, সেখানে গিয়ে, পয়সা ফেলে, সাইকেল ভাড়া করে তৎক্ষণাৎ ছুট লাগায়। তার অযথা কালক্ষেপ করার সময় নেই।

বক্কেশ্বর আইচের সেই আড্ডাখানার উদ্দেশ্যে সে উধাও হয়। যেমন করেই হোক, গ্র্যান্ড মামার আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছাতে হবে। যেমন করেই হোক উদ্ধার করতে হবে নষ্টরত্নদের—না করে তার উদ্ধার নেই। বড়ো বড়ো মহাত্মারা যেমন পাপীতাপীদের সমুদ্ধার করে, সমুচিত ভাবে উদ্ধৃত করে পরিশেষে নিজেরা উর্ধ্বলোকে যান, তেমনি ছোটোখাটো একটা অবতার-স্বরূপ নিজেকে গণ্য করে শিশির। এবং এই নতুন অবতারণায় সে যখন সাইকেলে আর তার গ্র্যান্ড মামা পদব্রজে তখন উদ্ধারের পথে পরিষ্কাররূপে সে যে অনেকখানি এগিয়েই রয়েছে, তার আর ভুল নেই।

মামার আড্ডাখানায় পৌঁছে, সাইকেলটাকে এক কোণে লুক্কায়িত রেখে সে সেই উঁচু-করা বাক্সগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং খানিক পরেই হন্তদন্ত হয়ে গ্র্যান্ডমামাও সেখানে এসে হাজির। বক্কেশ্বরের সাড়া পেতেই তাঁর দলবলেরা হৈ হৈ করে এঘর-ওঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। কী হল কর্তা? কদ্দূর এগুল? উদ্ধার হল কাজ? এই ধরনের প্রশ্নপত্র মুখে করে ঘেরাও হয়ে সবাই এগিয়ে আসে।

এই রে! ব্যাটারা সব বখরা নিতে আসছে! কম্মের ঢেঁকি, কেবল বখরা নেবার ওস্তাদ! বিনে পয়সায় বাগিয়ে নেবার ফিকিরে আছেন! দাঁড়া, দিচ্ছি বখরা। ভালো করেই দিচ্ছি।

এই বলে—নিজের কানে কানে এই কথা না বলে—বক্কেশ্বর আইচ ঝটিতি তাঁর পকেট থেকে রত্নগর্ভ রুমালটা বের করে খাড়া-করা বাক্সগুলোর আড়ালে ফেলে দ্যান।

মেঘ না চাইতেই জল। শিশির ওরই নেপথ্যে দাঁড়িয়েছিল, ওত পেতেই ছিল বটে সে, কিন্তু এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিল না! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি, এইভাবে আপনা থেকেই, আকাশ ফুঁড়ে তার হাতে এসে পড়বে—কে ভাবতে পেরেছিল? যেমনি না রুমালের ঝুপ করে পড়া আর অমনি ওর নিঃশব্দে টুপ করে লুফে নেয়া। ব্র্যাডম্যান বল হাঁকড়ালে কার্তিক বোস যেমন ক্যাচ ধরে থাকে ঠিক তেমনি।

দলবলরা এসে পড়তেই বক্কেশ্বর আইচ মুখে কাঁচু-মাচু করে জানিয়ে দ্যান : নাঃ,

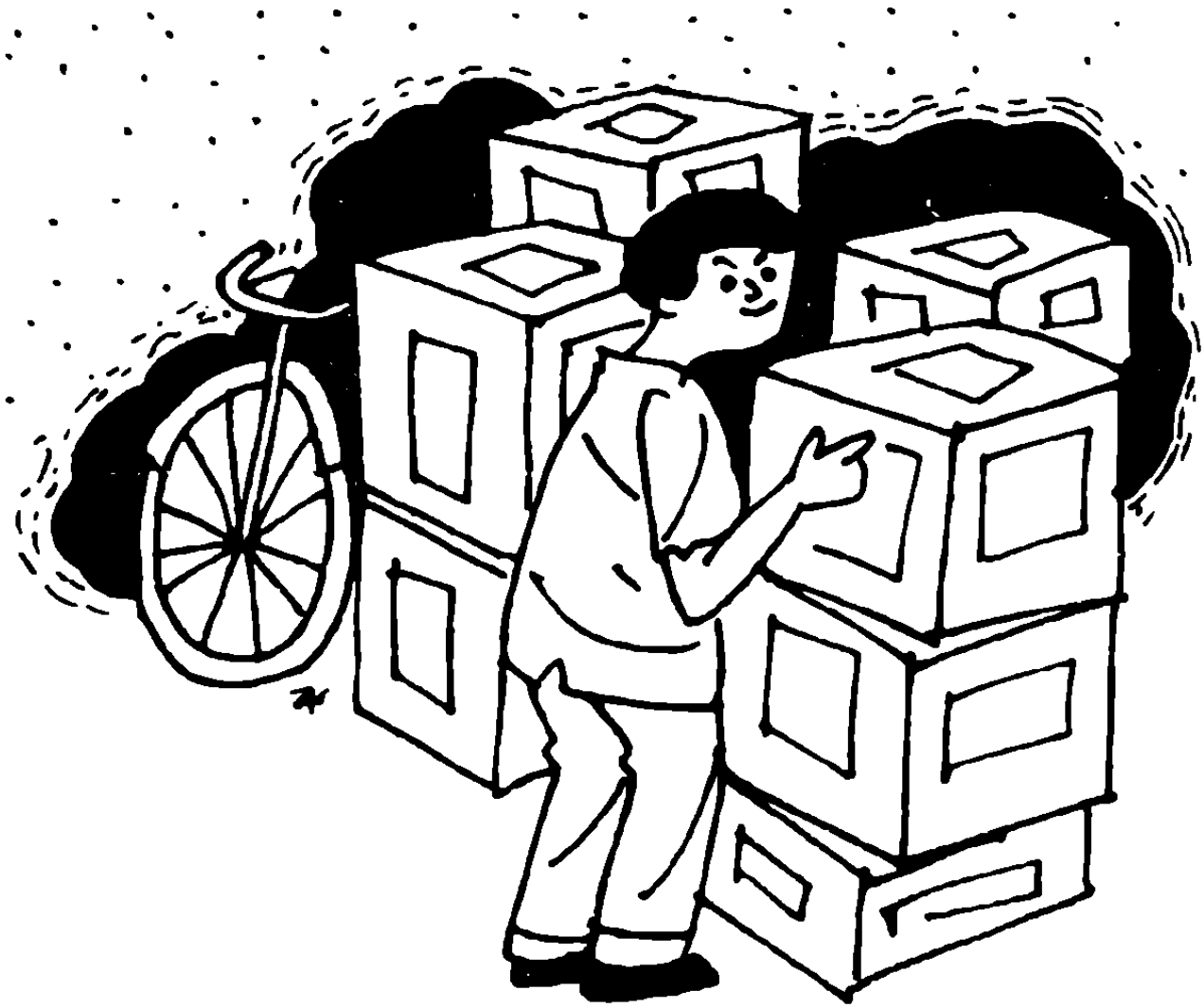

হল না, কিছুই হল, না। ভগনের খর্পরে গিয়ে যখন পড়েছে তখন আর রক্ষে আছে—ভাগনেরা কী কম বিচ্ছু? এ তো আবার ভাগনের ভাগনে, একেবারে জলবিছুটি!

কী! প্ল্যানটা উদ্ধার করতে পারা গেল না? দলবলরা বক্কেশ্বরের চেয়েও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

আর প্ল্যান! —বক্কেশ্বরের দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালেন ঃ প্ল্যানও উদ্ধার করেছিলাম. গুপ্তধনের কিনারা করতেও বাকি ছিল না, কিন্তু হলে কী হবে? ভাগনের ভাগনে যেখানে পিছু নিয়েছে—পেছনে লেগেছে যে ক্ষেত্রে—সেখানে উদ্ধার করলেই বা কী! আবার তার হাতে চলে গেছে সে সব।

অ্যাঁ? উদ্ধার করার পর—আবার চলে গেল? সকলে একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে।

গেলই তো! মিথ্যে বলছি না, আমার যথাসর্বস্ব সমস্তই আবার সেই মহাভাগনের হাতে গিয়ে পড়েছে। তার কবলেই সব এখন।

মিথ্যে বলতে গিয়ে কত বড়ো একটা মহাসত্য, নিজের অজ্ঞাতসারেই, গ্র্যান্ড মামা উচ্চারণ করেছেন, ভেবে শিশিরের হাসি পায়। রুমাল আর রুমালের ভেতরের মাল সে মুঠোর মধ্যে চাপে—আদর করে নিজের গালে বুলোয়—আর অতি বড়ো মিথ্যাবাদীরাও কেমন করে সময়ে সময়ে সত্য কথায় ফাঁপরে পড়ে যায় ভেবে মনে মনে বিস্মিত হতে থাকে।

দলবলরা সমবেত হয়ে হায় হায় করে। হা হুতাশ শেষ করে অতঃপর কিংকর্তব্য জানবার লালসা জানায়।

কী আর করা? এবার চাটি-বাটি গুটোতে হবে এখানে থেকে। থানায় আমার ফোটো লটকানো আছে সেই বদ ছেলেটা তা জানে। এবার আলবত সে গিয়ে বলে দেবে। পুলিশে খবর পাবার আগেই এখান থেকে সরে পড়া, এই এখন আমাদের কাজ।

গুপ্তরত্ন উদ্ধার না করেই সরে পড়ব? ওদের ভেতরে একজন বলে ওঠে।

আমরাই বা একেকটা কী এমন কম রত্ন? আগে নিজেদের তো গুপ্ত রাখি। নিজেরা উদ্ধার পেলে, প্রাণে বাঁচলে, অনেক গুপ্তরত্ন উদ্ধারের সুযোগ জীবনে আসবে।

একথার পর আর কথা নেই—সকলেই একবাক্যে ঘাড় নেড় সায় দ্যায়। ঠিক হয় বক্কেশ্বর আইচ সিঙ্গাপুরের দিকে পাড়ি দেবেন, আর দলবল সব রেঙ্গুন হয়ে অ্যাকিয়াবের দিকে রওনা হবে। পুলিশের সন্দেহ এড়ানোর জন্যই এই—কর্তা একদিকে কর্মরা অন্যমুখো উধাও হবার ব্যবস্থা, আপাতত কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে অচিরে, পরে আবার মন্দালয়ে গিয়ে নতুন ক্রিয়ায় সম্মিলিত হলেই হবে। মৌলমীনের বন্দর থেকে পরশুদিন দুধারের জাহাজই ছাড়ছে—তাতেই টিকিট কাটবার জন্য দলবলকে তিনি তক্ষুনি বেরিয়ে পড়বার হুকুম দিলেন।

দলবলরা কেটে পড়তেই, বক্কেশ্বর আইচ নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগ্রেট ধরালেন: উঃ, এতক্ষণে একটু দম দিতে পারা গেল! বাপ!

শিশির যে-মুহূর্তে, প্যাকিং বাক্সের আবডালে আনন্দে বেদম, প্রায় তার কানের গোড়াতেই যেন তখন আওয়াজটা এসে লাগে—কে যেন ছুঁড়ে দ্যায় পেছন থেকে—

কই হে! দাও তো দেখি এবার!

কে বলছে? কী বলছে?—কাকে বলছে? শিশিরের চমক লাগে। এতো তার গ্র্যান্ড মামার পেটেন্ট গলা—কিন্তু তার কানের গোড়ায় কেন?

কী! 'ফল ধরো রে লক্ষ্মণ' করে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? হাতের সুখ তো যথেষ্ট হল, এখন দাও ওগুলো।

অ্যাঁ! তাকেই ডেকে বলা হচ্ছে যেন না? শিশিরের কেমন একটু সন্দেহ জাগে। কিন্তু সে যে ওখানে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে এতো গ্র্যান্ড মামার জানার কথা নয়। কানের ভ্রম নাকি তাহলে?

সন্দেহ দূর হতে দেরি হয় না। ঠক করে পিস্তলের বাঁটটা তার মাথায় এসে ঠোক্কর লাগায়!

"ইস্! তুমি তো বড়ো বেকুব দেখছি হে! ভারী বোকা তো!" কাষ্ঠ ঘোমটা ফাঁক করে গ্র্যান্ড মামা ওর মুখদর্শন করেন।

শিশির শুধু বলে: ইস্!

এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত মাল মায় রুমাল সমেত গ্র্যান্ড মামার হাতে তুলে দ্যায়—নিজের অস্থাবর যা কিছু অপরের হস্তান্তর করে যথাসর্বস্ব খুইয়ে, সম্পত্তিহারা শিশির, নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বাঁচে।

গ্র্যাণ্ড মামার গ্র্যাণ্ড স্ট্র্যাটেজি

তোমার আগমন বার্তা কী করে টের পেলুম ভেবে তোমার তাক লাগছে। তাই না? ঠিক নিউটনের নিয়মে—মাধ্যাকর্ষণের জোরেই জানতে পারলুম। রুমালটা বাক্সগুলোর ওধারে চালান করার সময়েই সব জানতে পেরেছি। মালগুলোর নিঃশব্দ চালচলনেই সমস্ত পরিষ্কার হয়েছে। ওদের নিঃশব্দে গিয়ে পড়বার কথা তো নয়। মাধ্যাকর্ষণের জোরে মাটিতে গিয়ে পড়বে আর সশব্দে গিয়ে পড়বে। তাল পড়ে টিপ করে জান তো? টিপ করে তাল পড়ে তাও বলা যায়। কিন্তু পড়ে আর আওয়াজ ছাড়ে নিউটনের নিয়মেই। কিন্তু আমার তাল টিপ না করতেই কে যে ওখানে কোন তালে রয়েছে বুঝতে আমার দেরি হয়নি। জিনিসটা যেন আশ্চর্যভাবে আলগোছে থেকে গেল ত্রিশঙ্কুর মতো ত্রিশূন্যে—ভারী জিনিসের এ রকম ভুতুড়ে ব্যাভার ভালো নয় তো! তারপর এধারে ওধারে তাকাতেই গাছের আড়ালে সাইকেলটা নজরে পড়ল! ব্যস—তোমার কায়দা কানুন জানতে আর বাকি রইল না! কেমন, এখন তো বুঝতে পারছ?—

বুঝতে শিশির অনেকক্ষণই পেরেছে, অনেক আগেই,—মাথায় পিস্তলের ঠোক্কর খাবার সাথে সাথেই তার দিব্য দৃষ্টি খুলে গেছল—তবে যেটুকু বুঝতে তবুও ওর বাকি ছিল, এতক্ষণে বিশদ হল। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে হাঁ করে ও বক্কেশ্বরের বকুনি হজম করে।

এখন তুমি বন্দী আমার! বুঝেচ তো! সুড়সুড় করে লক্ষ্মী ছেলের মতো আসবে—না, না? নইলে—নইলে দেখচ তো! পিস্তলের এই বাঁট দেখেচ? তোমার মাথায় এটা ভাঙতে হলে বিস্তর ক্ষতি হবে আমার। ও পিস্তল তো আর এখানে সারানো যাবে না।

ক্ষতির কথা আর বেশি করে খতিয়ে দেখাতে হয় না। বলতে না বলতেই শিশির বক্কেশ্বরের পেছনে পেছনে যায়! ছায়ার মতো অনুসরণ করে দোতালায় গিয়ে ওঠে।

এই ঘরে তুমি বন্দী, বুঝেছ ভায়া? বক্কেশ্বর মোলায়েম হাসি হাসেন : বন্দীশালার পক্ষে ঘরখানি তেমন খারাপ নয়। দেখেশুনে কী রকম বুঝছ?

শিশির ঘুরেফিরে ঘরখানাকে লক্ষ করে।

তাকিয়ে দেখচ কী? তেমন অসুবিধাজনক ঘর নয়। পালাবার পক্ষে প্রশস্তই। চম্পট দেবার সুবিধা করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। চেষ্টা করে দেখতে পার।

গ্র্যান্ড মামা ঠিক তার মনের কথাটি আন্দাজ করতে পেরেচেন। তাঁর কথার ধাঁচে সেই কথার আঁচ পেয়ে শিশির লজ্জিত হয়ে পড়ে।

পালানো আর এমন কঠিন কী? এই জানলায় শক্ত করে একটা দড়ি বাঁধবে—বেঁধে লটকে পড়বে, ব্যস্। তা বলে ভুল করে নিজের গলায় যেন বেঁধে বোসো না—তাই বেঁধে লটকো না যেন, সেটা কিন্তু ভারী খারাপ হবে আগেই বলে রাখচি।

সেই খারাপ একদিন তোমার বরাতে আছে। শিশির রাগ করে বলে—মনে মনেই বলে দ্যায় ঃ নির্ঘাত ফাঁসি রয়েছে তোমার অদৃষ্টে।

ওঃ, তাই তো! দড়ি কই? দড়ি তো নেই এ ঘরে। দড়ি একটা চাই যে!

এই বলে বক্কেশ্বর আইচ তাকে দাঁড় করিয়ে দড়ির খোঁজে অন্য ঘরে যান। খোঁজাখুঁজি করে ফিরে আসতে একটু তাঁর দেরিই হয়।

এর মধ্যে পালাবার চেষ্টা করনি যে তাই ভালো! খোলা দরজা দিয়ে সোজা পিঠটান দেওয়া একদম বন্দীদশার দস্তুর নয়। যা দস্তুর—যেভাবে পালানো নিয়ম—যাদৃশ পলায়ন বন্দীদের পক্ষে গৌরবজনক তার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে এই। এই বলে সপাৎ করে দড়াগাছটা শিশিরের উপরে উনি ফেলে দ্যান।

কী করে আমি পালাব সে তোমায় বলতে হবে না। এতক্ষণে শিশির একটা জবাব দেয়। আর কষ্ট করে বলে দিতে হবে না তোমায়।

না না, আমি কেন বলব! আমি বলবার কে? এসব তো পুঁথিপত্রে বিস্তারিত করে সব বলাই আছে। নেই বলা?

আছে কী না আছে আমি বুঝব।

দড়িটা শক্ত করে জানলার গোড়ায় বেঁধে দিয়ে যাই। কী জানি বাঁধনের দোষে,

যদি দড়ি সমেত ঝুলতে গিয়ে খুলে পড়ে হাত পা ভেঙে ফ্যালো! হাত পা ভাঙলেই তো হয়েছে একটা পিস্তল সারানোই আমার পক্ষে কঠিন, তার উপর তোমাকে সারাতে হলেই গেছি!

জানলার পাল্লায় তিনি দড়িটা মজবুত করে বেঁধে দ্যান।

এইবার সব কাজই সহজ হয়ে রইল। এগিয়ে রইল অনেক। এখন তোমার কর্তব্য হচ্ছে, আমি চলে গেলে—আমার সামনে সটকানো ঠিক উচিত হবে না—সুরুচিসঙ্গত হবে না—ঠিক আমার তিরোধানের পরে, ধীরে সুস্থে, ওই জানলা ধরে দড়ি বেয়ে সুড়ুৎ করে নীচে নেমে যাওয়া। আর নীচে পৌঁছোতে পারলেই তো ফতে! পৌঁছোলে কি পালালে! কিন্তু সাবধান, আগাগোড়া আমার নজর বাঁচিয়ে,—এই চোখে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না—তক্ষুনি গুলি ছুঁড়ব। নিয়ম তো সব মানতে হবে। মেনে চলতে হবে আইন-কানুন। যে বিয়ের যে মন্ত্র—শাস্ত্রেই বলে দিয়েছে।

কী করে পালাতে হয় আমি জানি। এক কথায় শিশির জানিয়ে দ্যায়।

জানবে বই কি! কার ভাগনের ভাগনে, সেটা তো বুঝতে হবে। সত্যিই যদি বেমালুম পালাতে পার তাহলে সেটা খুব সুখের কথাই! তাহলে তেমন বাহাদুর ছেলেকে এক আধটা দামি রত্ন উপঢৌকন দিতে আমার দ্বিধা নেই। এই দ্যাখো, এই দুটো রত্ন-ডিম্ব এখানে রইল, সযত্নে রেখে দিয়ে গেলুম। একটা তোমার আর একটা তোমার বোনের—পালিয়ে যাবার সময় নিয়ে যেতে ভুলো না যেন।

আমার মামার জন্যেও একটা দাও। শিশির আবেদন করে।

সেই আদেখলা ভাগনেটার জন্যে? অপদার্থটাকে কিছু দিতেইচ্ছা করে না। তবে তুমি বলছ, তার জন্যেও একটা থাকল। তিন তিনটে গেল, যাক দশটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

একেশ্বর হয়েই আমরা খুসি। শিশির হাসিমুখে জানায়।

বেশ, ভালো কথাই। এইবার আমি বাইরে থেকে দরজায় তালা চাবি মেরে চলে যাই—আহারাদি করি গে। বাজারে গিয়ে কেনাকাটা সারতে হবে—অনেক কাজ। পরশুই এখান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করচি তো! হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে গেছি বলতে—যেতে যেতে, থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফেরে তিনি বলে যান ঃ আসল কথাই বলতে ভুলেছি।

কিচ্ছু বলার দরকার নেই। সব আমি জানি। শিশির নিজের কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে গ্র্যান্ড মামার অধিক উপদেশের অপেক্ষা রাখে না।

সেই ডালকুত্তাগুলোর কথা মনে আছে কি? তোমাদের যারা কালকে তাড়া করে গেছল? বেচারাদের বেজায় শাস্তি হয়েছে। তাড়া করবার জন্য নয়, তাড়া করে তোমাদের ধরে আনতে পারে নি সেই কারণেই কাল থেকে ওদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে আছে।

উচিত শাস্তি দিয়েছেন। শিশির অতিশয় উল্লসিত হয়।

হ্যাঁ, আর তারা রয়েচে এই জানলার নীচেটাতেই—ঠিক যেখানে এই দড়িটা গিয়ে

শেষ হয়েছে সেইখানে। কাল থেকে কিচ্ছুটি খায়নি বেচারিরা। যদিও নিতান্ত অনাহারী কাজ, তবু তোমাকে যদি ব্রেকফাস্ট্ করতে পায় যদি তুমি করতে দাও—না কি, তোমার তাতে খুব আপত্তি আছে? তোমার টেস্ট তেমন সুবিধের হবে না তুমি বলতে চাচ্ছ?

১৬
শিশির সাহায্যে শিশিরের উদ্ধার

শিশির রুদ্ধঘরে খানিকক্ষণ ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। ক্ষোভ হবারই কথা নষ্টরত্ন স্বহস্তে লাভ করে, অভাবিত পুনরুদ্ধারের পর, আবার যদি তা সেই হাত থেকেই লোপ পায়—হাতে হাতেই লোপাট হয় তাহলে কার না ক্ষোভ হবে? এবং কেবল খোয়া যাওয়াই নয়, তারপরে এই সব খোয়ার! শিশির অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়ে।

বিচলিত হয়ে ঘরটার চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে জানলার বাইরে গিয়ে মুখ বাড়ায়। এদিকে ওদিকে উঁকি-ঝুঁকি মারে, কই একজন কুকুরেরও তো ল্যাজ দেখা যাচ্ছে না! গ্র্যান্ড মামার স্রেফ ধাপ্পা নয়তো? হ্যাঁ, খেতে না পেলে ওরা বসে থাকবার পাত্র নাকি! খাবার সন্ধানে নিশ্চয়ই পাড়া বেড়াতে গেছে।

এ হেন সুবর্ণ-সুযোগ—পরিত্রাণের এই অর্ধোদয়যোগ উপেক্ষা করবার নয়! শিশির সেই ঝোলানো দড়ি ধরে ঝুলন যাত্রা করে বেরিয়ে পড়তে চায়! মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করাও বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে না। গ্র্যান্ড মামার দেওয়া দুর্লভ ডিম তিনটে, শার্টের তিন পকেটে পুরে, দড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে।

প্রায় ধরাতলে গিয়ে পৌঁছয় আর কি, অবতীর্ণ হয় হয়, এমন সময়ে কোথ্থেকে গন্ধ পেয়ে ডালকুত্তার দল হৈ হৈ করে ছুটে আসে।

ওই রে! ওই ওই! তাদের ঘেউ ঘেউ-এর মধ্যে ওই একটি কথাই শোনা যায়। একবাক্যে ওরা অভ্যর্থনা করে।

শিশির আর মাটিতে পা দেয় না, ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্য মার্গে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, তরতর করে দড়ি ধরে আবার সে রুদ্ধ ঘরে এসে ওঠে। বাব্বা, কক্ষচ্যুত হওয়া কি সোজা? কেন যে চন্দ্র সূর্যরা কক্ষভ্রষ্ট হতে চায় না এক্ষনে বোঝা গেল! আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি।

শিশির ভাবল, সাঙ্কেতিক ভাষায় লিলির উদ্দেশে একখানা চিঠি লেখে। লিলি সেই চিঠি পেয়ে পত্রপাঠ, যে করেই হোক তাকে এসে উদ্ধার করবে।

পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বার করে চিঠি লিখতে বসল শিশির। একটু না ভাবতেই, সাঙ্কেতিক একটা ভাষাও আবিষ্কার করা তার পক্ষে কঠিন হলো না—

AE CTT AE TKNR MAK DB—

পত্রবাহক, সে যে মিঞাই হোক্, তার নির্দেশের জন্যে এইটুকু মাত্র লিখে—লিলিকে সে বলল।

AK NA SA J KEY BPD—HAVE READ—AME KEY R BALL BOW—COST-A TK AC—AKN SO—SA—

দরজার ওধারে কী যেন খুট করল! শিশির কান খাড়া করল—সে নিজে উৎকর্ণ হল বটে কিন্তু তার লেখনী থামল না—OK—KLO OKLO ODK—?

এতখানি লিখে শিশির পড়বার চেষ্টা করে। এ কি রকম সাঙ্কেতিক ভাষা—এযে একেবারে জলের মত গড় গড় করে পড়া যাচ্ছে; বুঝতেও একটু দেরি লাগে না। কিন্তু—কিন্তু লিলি বুঝতে পারলে হয়! তাকে আবার বোঝাবার জন্যে শিশিরকে গিয়ে না পড়ে দিতে হয়।

শিশির আদ্যোপান্ত পড়ল ঃ

এই চিঠিটি এই ঠিকানার মেয়েকে দিবি—

এখানে এসে যে কী বিপদে—পড়েছে—আমি কী আর বলবো—কষ্টে টিকে আছি—এখানে এসো—এসে ও কে? কে এলো? —ও কে এলো ওদিকে?

এই পর্যন্ত লেখা হয়েছে ঃ এর পরে, তার মনে তখন থেকে যে সব ভাবের উদয় হচ্ছে, সাঙ্কেতিক ভাষায় সাহায্যে তার আবেগ প্রকাশ করতে হলে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। পেনসিল থামিয়ে গালে হাত দিয়ে মাথা ঘামাচ্চে শিশির।

মাথা ঘামাতে ঘামাতে তার মনে হল—ঘর্মবিন্দুর মতোই ভাবনাটা ফুটে উঠল—ভাষায় এলেই বা কি? না হয় ভাষায় কুলিয়েই ওঠা গেল, কিন্তু সেই চিঠি—তার সেই সঙ্কেতধ্বনি—লিলির উপকূলে পৌঁছে দিচ্চে কে? আশেপাশে বাধিত করা তেমন বাধ্য গোছের লোক কই? থাকবার মধ্যে তো কতিপয় কুকুর,—কুকুরের ল্যাজে বেঁধে খবর পাঠানো চলে, এই ধরনের একটা কাহিনী পূর্বে তার কানে গেলেও এসব কুকুরের সম্বন্ধে সে কথা ভাবতেই পারা যায় না। না, ল্যাজ এদের থাকলেও, এরা সে কুকুর নয়।

অগত্যা, চিঠি লেখা ফেলে, পত্রান্তরাল থেকে বেরিয়ে, অন্য পথে মুক্তির উপায় সে খুঁজতে লাগল!

আঁতিপাঁতি করে চারিধারে তাকিয়ে, ঘরের কোণে, ছোট্ট এক কুলুঙ্গিতেহিমানির শিশির মতো কী একটা তার চোখে পড়ল। হাতিয়ে নিয়ে দ্যাখে—হিমানির শিশিই বটে, কিন্তু হিমানি নেই—থাকলেও এ সময়ে নিজের মুখে চুনকাম করার তার উৎসাহ হত কিনা সন্দেহ। বরং তার গর্তে যে বস্তুটি দেখা গেল তার বর্ণ-পরিচয়ে যে কথা বলে তস্য গন্ধবিবরণীতেও ঠিক সেই কথাটিরই—হ্যাঁ—হ্যাঁ-হ্যাঁচচো—সাক্ষ্য দ্যায়। তার নাক আর শিশির মুখে এক বিজ্ঞাপন—নস্যি ছাড়া আর কিছু নয়!

গ্র্যান্ড মামার সবই গ্র্যান্ড! যেমন পেল্লায় শরীর—তেমনি পেরকান্ড নাক—আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তেমনি একখানা নস্যির ডিবে! তিনজনাই যারপরনাই—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁচচো—নাকের জলে চোখের জলে একশা হয়ে হাত পা নেড়ে মাথা ঝেড়ে—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁচচো!

হাঁচতে হাঁচতে, মাথা পরিষ্কার হয়ে, তার বুদ্ধি খুলে যায়! এই তো! স্বহস্তেই তো! নিজের সমুদ্ধারের যৎপরোনাস্তি সরল পথ। এই হিমানি মার্কা বৃহৎ ডিবিয়ার ভেতরেই তো সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করছে তার মুক্তির উপায়! এতক্ষণ কি সে কথা তার নাকের মধ্যে সেঁধয়নি?.....

পকেট থেকে রুমাল বের করে পরিষ্কার করে মুখ মুছে তাতে বেশ ভালো করে এপিঠে ওপিঠে নস্যে মাখিয়ে জানলা গলিয়ে ডালকুত্তাদের সম্মুখে ফেলে দিল শিশির। একে এই ডালকুত্তারা গন্ধর্বশ্রেণীর, তার উপরে গতকাল থেকে বুভুক্ষু—রুমাল-পতনের সাথে সাথেই ওদের একজন এসে শুঁকে দেখেছে। আর—আর যেই না শোঁকা—অমনি—অমনি না—যা একখানা জিনিস হল তাকে অকথ্য না বলে উপায় নেই। কুকুরের হাঁচি মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার বর্ণনার ভাষা নেই!

দেখতে না দেখতেই প্রত্যেকেই সেই রুমালটা এসে শুঁকেচে—

আর তার ফলে যে অনির্বচনীয় দৃশ্য—অশ্রুতপূর্ব কোরাস—পরমাশ্চর্য কাণ্ড শুরু হয়ে গেল তা আর কহতব্য নয়।

নস্যি-বোঝাই সেই রাম ডিবে পকেটফাই করে শিশির তরতর বেগে দড়ি বেয়ে নেমে যায় এবার।

সেই অধঃপতিত রুমালটি হস্তগত করে—বিদায়চ্ছলে সেই ডালকুত্তাদের মুখের উপর সেটি নাড়তে নাড়তে—যদি বা তাদের কেউ ওই রকম ব্যতিব্যস্ত অবস্থাতেই মরিয়া হয়ে তাড়া করে আসে তাহলে তক্ষুনি তার মুখের উপর সঙ্গে সঙ্গে নেড়ে দেবে তার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই—সেই সমবেত ঐকতান ভেদ করে শিশির সীমান্ত প্রদেশ পার হয়।

কিন্তু না, কুকুররা তাড়া করে না, নিজেদের অন্তর্গত তাড়নাতেই তারা অস্থির হয়ে আছে—ভেতরের আবেগে এত কাবু যে তাদের বুলি পর্যন্ত বেরোয় না।

তাদের হাঁচাহাঁচি নাচানাচির ভেতর দিয়ে সহাস্যবদনে শিশির বেরিয়ে যায়।

১৭

'একজনকে রোস্ট্ করব একজনকে টোস্ট্ করব'

সেখান থেকে শিশির একছুটে একেবারে মাতুল সমীপে।

এই নাও মামা, তোমার হারানো ধন! গ্র্যান্ড মামার কবল থেকে আমি উদ্ধার করে এনেছি—সাত রাজার ঐশ্বর্য এক মানিক!

এই বলে একটা ডিম্বাকৃতি রত্ন মামার কোলের উপর ফেলে দ্যায়।

মামা বিস্ময়বিহ্বল হয়ে রত্নটিকে—দুটি রত্নকেই এক দৃষ্টে দ্যাখেন। শিশির আর শিশিরের ডিম।

অ্যাঁ, আনলি? আনতে পারলি তুই! তার বাক্যস্ফূর্তি হলে বেরয় ঃ ধন্যি ছেলে তুই, সত্যি!

এখন নগদ কিছু টাকা দাও তো আমায়! সাইকেলওয়ালাকে মিটিয়ে দিয়ে আসি। তার ভাড়াকরা সাইকেলটা গ্র্যান্ড মামার আস্তানায় খুইয়ে এসেছি।

মামা সে-কথায় কান দ্যায় না—তাঁর কানেই যায় না সে কথা! তিনি সেই অপূর্ব ঐশ্বর্যটিকে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, লক্ষ করেন—আর তাঁর পর্যবেক্ষণের ফাঁকে ফাঁকে শিশিরকে চকিতের জন্যে নিরীক্ষণ করে নেন।

সাইকেলওয়ালাটাকে ঠিকানা দিয়ে দাও না! সেই লোক পাঠিয়ে উদ্ধার করে আনবে! লিলি পরামর্শ দ্যায়। তোমার নিজের যেতে চক্ষুলজ্জা হয় আমিই না হয় একটা পোস্টকার্ড লিখে ফেলে দিচ্ছি! গ্র্যান্ড মামার বাড়ির ছক কেটে পথ বাতলে দিলেই হবে।

তাই দে তো ভাই! শিশিরের ঘাড় থেকে যেন সাইকেলের পাহাড় নেমে যায়। সে আরামের নিশ্বাস ছাড়ে ঃ তোর বুদ্ধি খুব! সত্যি লিলি!

দাদার কাছে,—বিশেষত বিশল্যকরণী উদ্ধার করে আনা এরকম বীরোচিত দাদার কাছে থেকে এহেন সার্টিফিকেট লাভ করে এক গাল হেসে লিলি তক্ষুনি তক্ষুনি চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ছেড়ে দিয়ে আসতে যায়।

মামা স্থাবর রত্নটিকে ট্যাকস্থ করে হন হন করে দরদালানে পায়চারি করতে থাকেন—আর এক কোণে দাঁড় করানো শিশিরের দিকে—তাঁর অস্থাবর রত্নটির দিকে মাঝে মাঝে ফিরে তাকান। যে রকম লোলুপ নেত্রে দৃকপাত করেন তাতে মনে হয়, সম্ভব হলে সমাদরের আতিশয্যে তাকেও ট্যাকস্থ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। কিন্তু অত বড়ো ধাড়ি ছেলেকে ট্যাক-এ আনা দূরে থাক—কায়দা করে কোলে করাই কঠিন!

তিনি হন হন করে ঘুরপাক খান—আর ঝন ঝন করে নতুন টাকার মতো কথার টুকরো তাঁর মুখ থেকে খসে পড়ে ঃ

উঃ! এই মানিকটা! কত দাম এর কে জানে। হয়তো বারো লাখ—কিংবা সাত লাখ সাতাত্তর হাজারই হবে হয়তো। এক ক্রোড় হলেই বা কে কী বলছে! এই দিয়ে

বোধহয় এক জমিদারই কেনা যায়। কিন্তু—কিন্তু—যদি এর দাম দশ বিশ ক্রোড় হয়ে পড়ে—তাহলে?

এই সদ্যোজাত সমস্যা নিয়ে শিশিরের মুখোমুখি এসে তিনি দাঁড়ান ঃ তাহলে? তাহলে কী?

প্রশ্নাঘাতে জর্জরিত হয়ে শিশির উত্তর দেবার চেষ্টা করে ঃ

তাহলে? তাহলে গোটা আসামটাকেই আমরা কিনে নেব। মায় ধুবড়ি গোয়ালপাড়া গৌহাটি শিলং শিলেট শিলচর লামডিং নওগাঁ শিলঘাট জোড়হাট শিবসাগর তেজপুর ডিগবয় সব সমেত।

সারা আসামটাকেই এই ট্যাকে? প্রস্তাবটা যেন ব্রজেশ্বরকে ধাক্কা মারে—এতদূর—এতখানি তিনি ভেবে দ্যাখেননি। কিন্তু ভেবে দেখে—আসামের মানচিত্র ভেবে ভেবে আর দেখে দেখে—প্রস্তাবটা তাঁর মনে লাগে। শিশিরের কথাটা তার মনঃপূত হয়—তিনি সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ঃ গোটা আসামটাই এই ট্যাকের আসামি? তা—তা মন্দ কী?

মন্দ কী? শিশিরেরও কথাটা খুব মন্দ লাগে না।

• পুলকের আধিক্যে ব্রজেশ্বর শিশিরকে দুহাতে উঁচু করে তুলে ধরেন ঃ ভালা

মোর ভাগনে! তুলে ধরে গদ্‌গদ্‌ দৃষ্টিতে তাকান ঃ এমন চমৎকার ভাগনে প্রায় দেখা যায় না।

বাহুগ্রস্ত শিশির লজ্জায় আর আনন্দে বিগলিত হয়ে ছটফট করে—মামার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মাটিতে পা দিতে পারলেই বাঁচে।

মামা কিন্তু সহজে ছাড়ে না—ভাগনে আর ভাগনের প্রতি স্নেহ—দুই তখন তাঁর মাথায় উঠেচে। শিশিরের এহেন মাতুল-ভক্তির পরাকাষ্ঠার প্রতিদান দেবার তাঁর বাসনা হয়।

'নাঃ, সামান্য মৌখিক আদরে এই উপকারে ঋণ শোধ হবার নয়। এর সমুচিত প্রতিদান দিতে হবে। ভাগনেরা যে আমাকে ভালোবাসতে পারে এতদূর ভালোবাসতে পারে আমি তা জানতুম না। ব্রজেশ্বরের চোখের কোণে শিশিরবিন্দুরা দেখা দেয়।

শিশিরের জামার হাতায় চোখ মুছে তিনি বলেন ঃ আয়! আমার সঙ্গে আয়। লিলি? লিলিটা গেল কোথায়? সেও আসুক।

লিলি ততক্ষণে তার বক্তব্য ডাকবাক্সে পরিত্যাগ করে ফিরেছে, মামার হাঁকে তক্ষুনি এসে হাজির হয়।

লিলিও আমার খুব চমৎকার মেয়ে! মামার স্নিগ্ধ কণ্ঠ বেয়ে স্নেহের ঝরনা নেমে আসে। দুজনকে সমাদর করে নিজের ঘরে তিনি নিয়ে যান।

বোস, এই খাটের উপরে বোস তোরা। ততক্ষণ বোস।

তৎক্ষণাৎ তিনি বেরিয়ে যান—তারপর কী মনে করে ফের ফিরে এসে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাহির থেকে শেকল তুলে দ্যান।

বেশি দেরি হবে না, আমি এই এলুম বলে। এই বলে বোধ হয় সান্ত্বনা-দানের ছলেই বাহির থেকে পুনরায় বলেন ঃ

ভয় খাস নে, ভয়ের কী আছে? তোদের একজনকে রোসট করব—আরেক জনকে—?

আরেক জনকে কী করা যায়, কীভাবে আপ্যায়িত করা যায়—কোন সুখাদ্যে পরিণত করতে পারলে বেশি সুস্বাদু হয়—একটু ভেবে ঠোঁট চেটে নিয়ে তিনি জানান ঃ আরেক জনকে টোসট করা যাক? কেমন, টোসটই তো ভালো—তাই না?

১৮

মামা তোমার মনে এই ছিল?

মামার বাণী শুনে শিশিরের গা শিরশির করে ওঠে।

আমাদের জন্যে রোস্ট আর টোস্ট আনতে গেল মামা, তাই না? জিজ্ঞেস করে লিলি—আমার ভাগে খালি যদি টোস্ট পড়ে দাদা, তাহলে কিন্তু ভালো হবে না। রোস্ট আর টোস্ট আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে খাব, কেমন?

লিলির নিমন্ত্রণে শিশিরের উৎসাহ দেখা যায় না—সে শুধু বলে ঃ আমাদের আর খেতে হবে না। মামাই সারবে।

মামা একাই সমস্তটা খাবে? সবখানি রোস্ট আর—?

পুনশ্চ যোগ করে সংক্ষেপেই শিশির জানায়ঃ উঁহু; মামাই খাবে আমাদের।

আমাদের খাবে—আমাদের? অ্যাঁ? বিষয়টা ভালো করে বোধগম্য হবার সাথেই লিলি ককিয়ে ওঠে।

তাহলে শুনলি কী তবে? তারই বন্দোবস্ত করতে গেল, বলে গেল কী? দরজায় শেকল এঁটে গেছে দেখছিস নে?

তাই তো—তাই-ই তো! মামার বিবৃতির সঙ্গে কার্যকলাপ জড়িয়ে দেখলে তাই মনে হয়! আর সেই সঙ্গে মামার প্রাচীন ইতিহাস—মামার পূর্ব-জীবনের ভ্রমণবৃত্তান্ত—সেই অখাদ্য নরখাদককে খাদ্য করার লালায়িত কাহিনী স্মরণ করে মিলিয়ে নিলে এছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না।

গ্র্যান্ড মামাকে পারা গেছল—মামার মামাকে হয়তো পারা যায়—সে তো আর সাক্ষাৎ মামা নয়—কিন্তু এই নিজের মামার স্নেহের ক্ষুধা থেকে নিজেদের বাঁচানো কী করে সম্ভব শিশির ভাববার চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে গিয়ে মুষড়ে পড়ে! লিলি তো খাটে লম্বা হয়ে পড়েছে। ভয়ে হাতে পায়ে খিল লেগে গেছে তার—মুখে কথা নেই!

ভয় কী, আমি ঠিক উদ্ধার করব। মনে মনে দমে গেলেও লিলিকে সে দম দ্যায়—তার প্রাণে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করেঃ

আমার একার হলে কথা ছিল না! আমি না হয় মামার পেটে চলে যেতে পারতুম—

হাসতে হাসতেই চলে যেতুম। লোকে পরের জন্যে প্রাণ দ্যায়—মামা তো আর কিছু পর নয়। বৃষকেতু কার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল? নিজের অস্থিমজ্জা মাংস দিয়ে অতিথি সৎকার করতে সে কুণ্ঠিত হয়নি—দাতাকর্ণের গল্প পড়েছিস তো? বৃষকেতু কি আস্ত একটা বৃষ ছিল—গোরু ছিল একটা? আদৌ না! ঠিক কাজই করেছিল সে।

দাতাকর্ণ পড়েছি। লিলি ঘাড় নাড়ে জানায়।

হ্যাঁ কর্ণের মতো দাতা নেই। আগে পরের কথায় কান দিলেই, তার পরে আর না দিয়ে পার নেই। শেষে নির্ঘাত প্রাণ দিতে হয়। এইজন্যেই পরের কথায় কর্ণদান করা নিষেধ। মামার কথা শুনে এঘরে না এলে তো আমাদের এই ফাঁদে পড়তে হত না! কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে—সেকথা যাক। আমি তো একা নই—একা হলে মরতে আমার বাধা ছিল না, তুই আছিস যে! যে করেই হোক, ছোটো বোনকে আমার বাঁচাতে হবে। দাদার আশ্বাসে, ভয়ানক ভরসা পেয়ে, লিলি এতক্ষণে উঠে বসে। ওই ছোট্ট দাদাটির উপর তার অগাধ আস্থা।

কী করবে ভেবেচ? সাগ্রহে সে জানতে চায়।

দেখি কী করা যায়। মামাকে বলে কয়ে দেখি—তোকে ছেড়ে দ্যায় যদি। আমারই আধখানা রোস্ট আর আর আধখানা টোস্ট করে—আমার উপর দিয়ে চুকে যায় যদি।

না—না—না! লিলি বলে ওঠে ঃ তা হয় না।

কেন হয় না, শুনি? একটা মামা, একলা মামা কত খাবে?

উঁহু, তাহলে আমি বাদ যেতে রাজি নই। লিলি ঘোরতর আপত্তি জানায়—শিশির যদি না বাঁচে তাহলে সেও সহমরণে যাবে। মামার উদরপথে সেও তবে দাদার সহযাত্রী।

আমি তোকে এই দুটো দিয়ে দেব। শিশির লিলিকে ডিম দুটো দেখায়—এর একটা তোর, একটা আমার,—গ্র্যান্ড মামা দিয়েছে। আমারটাও তোকে দিয়ে দেব। তুই দেশে গিয়ে এই বেচে খুব বড়োলোক হতে পারবি, কতো যে চটোলেট কিনতে পারবি তার ইয়ত্তা নেই। আর ঘর ভর্তি চীনে বাদাম! শিশির লিলিকে লোভ দেখায়।

না না—সে হয় না। লিলি তথাপি ঘাড় নাড়ে।

তাহলে তো ভারী মুশকিল হল! দুজনকেই দেখছি উদ্ধার করতে হবে আমায়। ভারী শক্ত কিন্তু।

শক্ত তো বটেই—শিশির ঘাড় হেঁট করে ভাবে। একজনকে বাদ দেয়ানো যেত—কিন্তু দুজনকে বরবাদ করতে মামাকে রাজি করানো যাবে কিনা সন্দেহ।

লিলির সহসা কৌতূহল হয় ঃ মামা হঠাৎ আমাদের খেতে চাইছে কেন? আমরা কী করেছি?

বাঃ, মামার ধনরত্ন উদ্ধার করে এনে দিলুম যে!

সে তো ভালোই করলুম মামার।

ভালোই তো! মামাও তো সেটা ভালোভাবেই নিয়েছে। আর তাতেই আমাদের হল কাল! মামা আমাকে ভালোবেসে ফেলল যে! আমার খাতিরে তোকেও আবার ভালোবাসল কিনা!

লিলি শিউরে ওঠে—স্টেশন থেকে তাদের নিয়ে আসার সময় মামার গল্প তার মনে পড়ে। ব্রজেশ্বরের অভিযানে—সেই নরখাদক গলাধঃকরণের পর—সেই বনভোজনের পর থেকে—ভালোবাসার একটি মাত্র অর্থ! যাকে ভালোবাস তাকে ভালো জায়গায় বাসা দাও! আর হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটে উদরের মতো এত উপাদেয় স্থল আর কোথায়?

ঘি গলবার কলকলধ্বনি ওদের কানে আসে। খড়খড়ি ফাঁক করে সন্তর্পণে ওরা দ্যাখে, এর মধ্যেই মামা ইঁটের পাঁজা সাজিয়ে, দরজার অদূরেই প্রকাণ্ড একটা উনুন খাড়া করেছে। আর সেই উনুনের মাথায় পেল্লায় এক কড়াই—। এইমাত্র তলাকার শুকনো কাঠে আগুন ধরানো হল—এধারেও দাউ দাউ করে উঠেচে আর ওধারেও কড়াইয়ের উপরে ঘি কলকল করতে লেগে গেছে।

উনুনের একপাশে স্তূপীকৃত কাঠ—আর তিনটে ঘিয়ের ক্যানাস্তারা ফাঁক। এর মধ্যেই মামা ইঁটে আর কাঠে, আর ঘৃতাহুতিতে তাঁর দক্ষযজ্ঞ অনেকখানি এগিয়ে এনেচেন!

ঘিয়ের কলকল ধ্বনি শুনে আর জ্বলন্ত দৃশ্য দেখে শিশিরদের চোখ তো ছানাবড়া।

হায় মামা, তোমার মনে শেষে এই ছিল, দীর্ঘনিশ্বাসের সাথে সাথে লিলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ঃ তুমি যে আমাদের হাড়-মাস ভাজাভাজা করবে, তা ভাবতেও পারিনি!

১৯
প্রাণ নিয়ে টানাটানি লেন

ঘি যতই কলকল করে, লিলির চোখ ততই ছলছল করে। শিশির বলে ঃ ঘিটা ভালো নয়—শ্রীঘৃত নয়—বিশ্রী ঘি!

লিলি কোনো জবাব দ্যায় না।

চর্বির ভ্যাজাল আছে, গন্ধে টের পাচ্ছিস নে? শিশির পুনরপি বলে।

জ্বাল দেয়ার সাথে সাথেই জালিয়াতি জানা গেছল—দুর্গন্ধে মাত করে দিয়েছিল চারধার। কিন্তু চর্বির ভ্যাজাল থাকলেই বা কী, খাঁটি ঘিয়ের তুলনায় তার ভাজবার ক্ষমতা কি কিছু কম? হাড়-মাস ভাজা ভাজায় সেই বা কম যায় কীসে? আর চর্বির ভর্জিত হলেই বা মামার চর্বিত চর্বণের পক্ষে অসুবিধা কোথায়? বড়ো জোর ব্রজেশ্বরের অম্বল হতে পারে—গলাজ্বালা পেটের অসুখ অবধিও গড়াতে পারে হয়তো—কিন্তু তাতে আর গরহজম-হওয়াদের কী সান্ত্বনা?

লিলি চুপটি করে থাকে। ঘিয়ের বিষয়ে কেন যে অত খুঁতখুঁত হতে হবে সে ভেবে পায় না।

মামা তো কই এখনো কাটছে না আমাদের? শিশিরকে একটু যেন ব্যস্তই দেখা যায় ঃ আস্তই চাপিয়ে দেবে নাকি?

আস্তে আস্তেই টের পাব। লিলি বলে। দাদার এত ব্যগ্রতা তার ভালো লাগে না।

কাটুক কী কুটুক কী আগুনেই চাপাক, দরজাটা একবার খুললে হয়। শিশির বলে ঃ একটা মতলব এঁটে রেখেছি।

কী মতলব! লিলির এবার আগ্রহ দেখা দেয়।

আমার কাছে সেই প্ল্যানখানা রয়েছে কিনা! মামাকে একটু ধাপ্পা মারতে হবে। মামাকে বলতে হবে যে এই রত্নটি তো কেবল নমুনা মাত্র! এরকম আরো বিস্তর সেই গুপ্তকক্ষে লুকানো রয়েছে। এই প্ল্যান ধরে খুঁজে পেতে বার করতে হবে। এই না শুনলে মামা নিশ্চয়ই লোভে পড়ে তক্ষুনি সেই ঘরে খুঁজতে যাবে—আমাদের রান্নাবান্না আপাতত স্থগিত রেখেই চলে যাবে। আর আমরা সেই ফাঁকে—

বুঝেছি। বাধা দিয়ে লিলি বলে ওঠে ঃ কিন্তু মামা ভারী হুঁশিয়ার, এমন তৈরি রোস্ট ফেলে রেখে—বেগুনি ফুলুরির ফলার ফেলে—

আরে, ভোজনের আগে দক্ষিণা পেলে কে না খুশি হয়! মামা তো মামা! দেখিস না কেন, কেমন দৌড় মারে—দেখিস তখন!

মামার আগমনের প্রত্যাশায়—দ্বারোদ্ঘাটনের অপেক্ষায়—গ্র্যান্ড মামার ফেরত দেয়া প্ল্যানখানা পকেট থেকে বার করে শিশির। প্ল্যানটার পেছনে—অপর দিকে—এ আবার কীসের খসড়া? আরেকখানা নকশার মতো দেখা যাচ্ছে যে! এ আবার আরেক কোন গুপ্ত কক্ষের হদিস?

শিশির বিস্মিত হয়ে নতুন নকশাটার উপরে চোখ বুলোয়। যে ঘরে তারা বন্দি রয়েছে, অনেকটা সেই ঘরের ছক মতন যেন! ছকের নির্দেশ মত অনুধাবন করে—ঘরের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করে একটা কোণে গিয়ে তারা হাজির হয়।

সেখানে কোণঠেসা হয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে শিশির ঘা লাগায়।

অবাক কাণ্ড! ঘা মারতেই জায়গাটা যেন নড়তে থাকে—তারপর আস্তে আস্তে সরতে সরতে অনেকখানি ফাঁক হয়ে যায়, সামনে একটা সুড়ঙ্গের মতো ফাঁকি বেরিয়ে পড়ে! শুঁড়িপথ দেখা যায়।

টেবিলের উপর থেকে মামার টর্চটা নিয়ে আয়তো লিলি।

গুহার মধ্যে আলো ফেলতেই যতদূর স্পষ্ট হয় তাতে সুড়ঙ্গ বলেই সন্দেহ হয় বটে! কিন্তু সুড়ঙ্গরূপী এই সন্দেহকে অনুসরণ করে এগুনো যায় না—এ পথ গেছে কোন্‌খানে? এটাই প্রশ্ন।

সুড়ঙ্গটা যেমন নোংরা তেমনি আবার সন্দেহবাদী—কিন্তু যতই বিশ্রী হোক বিশ্রী ঘিয়ের পথ পরিত্যাগ করতে হলে এ ছাড়া সম্প্রতি অন্য পথ আর নেই, এই ভেবে টর্চ হাতে, ওরা সুড়ঙ্গ পথে পা বাড়ায়।

সুড়ঙ্গটা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নেমে গেছে। কোনো রকমে হেঁট করে অধোবদনে

নামা চলে। শিশির যায় আগে আগে—লিলির হাত ধরে। যতই এগোয়, বিচ্ছিরি সোঁদা সোঁদা গন্ধ ওদের নাকে এসে কামড় লাগায়।

খানিক দূরে এগুতেই সিঁড়ি কাঁপতে থাকে—ইটের গাঁথনি হলেও, কেন বলা যায় না, তাদের পায়ের ভারেই যেন টাল খায়। সামনে পেছনে—এধার ওধার থেকে এক আধখানা ইট খসে পড়ে।

এই! পা টিপে টিপে হাঁটছিস কী? তাড়াতাড়ি আয়। চারধার কাঁপছে, দেখছিস না? শিশির তাড়া লাগায় লিলিকে।

ভূমিকম্প নাকি দাদা? লিলি ভয় খেয়ে যায়! সুড়ঙ্গটা ওদের পিছু পিছু পড়তে পড়তে—ধরাশায়ী হতে হতে আসছে বলে মনে হয়।

তাহলেই তো হয়েছে। সুড়ঙ্গের মধ্যেই ইঁদুর মরা হতে হবে।সুড়ঙ্গের পেছনের পথ অবরুদ্ধ—তাদের অনুসরণ করে বুজে এসেছে—ক্রমশই বুজে আসছে। টর্চ ফেলেই দেখতে পায় ওরা। লিলিকে সাপটে নিয়ে শিশির তাড়াতাড়ি পা চালায়।

সুড়ঙ্গ পথের গোটা কয়েক বাঁক ঘুরে, নীচের তলে নেমে, নালার মতোন একটা প্রণালীর ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে ওরা বেরিয়ে আসে। বাইরের আলোতে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ে!

একী! সত্যিই তো। প্রকাণ্ড অত বড়ো বাড়িটা অমন করে কাঁপছে কেন? পায়ের মাটি স্থির অথচ—ভূমিকম্প তো নয়। কম্পান্বিত বাড়ির থেকে সভয়ে ওরা সরে এসে দূরে এসে দাঁড়ায়।

দেখতে না দেখতে সমস্ত বাড়িটা হুড়মুড় করে হৈচৈ করে ভেঙে পড়ে—ইটে কাঠে কড়ি বরগায় পুঞ্জীভূত হয়ে প্রত্যক্ষ বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

২০
বিনা টিকিটের যাত্রী

বাড়িটা ভারী ভয়াবহ, কেন যে সেই বর্মিজটা মামাকে একথা বলেছিল বোঝা যাচ্ছে এখন—শিশির বলে।

তুমিও তো বলছিলে বাড়িটার চালচলন ভালো নয়—লিলি মনে করিয়ে দেয়।

বলেছিলাম কিনা? প্রথম দর্শনেই মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। শিশির নিজের কথার প্রমাণ লাভ করে পুলকিত হয়ঃ দেখলি তো চালচলনটা? আরেকটু হলে আমাদের ঘাড়েই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আর কী! নিজের চোখেই তো দেখলি!

হুঁ। এ রকম গায়ে-পড়া বাড়ি ভালো না। লিলি মুখ ব্যাঁকায়।

কিন্তু মামা? মামা যে ঘিয়ের কড়াই নিয়ে ওর মধ্যেই থেকে গেলরে! শিশির লাফিয়ে ওঠেঃ চাপা পড়ে রইল যে! মামাকে তো উদ্ধার করতে হয়।

কিন্তু মামা যদি আবার খেতে চায়? লিলির ভীতি প্রকাশ পায়।

সে তখন দেখা যাবে। আগে তো মামাকে বাঁচাই।

শিশির এক একখানা করে ইট সরাতে আরম্ভ করে। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে প্রায় নব্বই আশিখানা ইট সরিয়ে ফ্যালে—লিলিও তার সহযোগিতায় এগোয়—কিন্তু দুজনে মিলে উঠে পড়ে লাগলেও সে আর কখানা ইট! পর্বত প্রমাণ ইটের পাঁজা তখনো তাদের সামনে স্তূপাকার! ধরাশায়ী অট্টালিকার নিঃশব্দ অট্টহাসির আকর্ণ বিস্তারের সামনে তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আরো খান দশেক ইট হটিয়ে শিশির হাঁফ ছাড়েঃ এক শতাব্দীতে কি পেরে উঠবে? এইসব ইট ঠাঁইনাড়া করতেই কলিযুগের বাকি কটা দিন কেটে যাবে।

মাগো! কম কি ইট! লিলিও যোগ দ্যায়ঃ এই কখানা নাড়তেই আমার হাতে ফোসকা পড়ে গেল! লিলি নিজের ফোসকানো হাতে ফুঁ দিতে দিতে বলে। —খান ত্রিশেক সে নড়িয়েছিল—কিন্তু তাই নড়াতেই তার নড়াতে ব্যথা হয়ে গেছে।

তাহলে—তাহলে আর কী হবে! শিশির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেঃ এই একখানা করে ইট সরিয়ে মামার কাছ অবধি গিয়ে পৌঁছাতেই আমাদের চুল দাড়ি সব পেকে যাবে। আমরা বুড়ো হয়ে যাব।

দাড়ি পাকার কথায় লিলির আপত্তি করার ছিল, শিশিরের দাড়িই হয়নি—এবং লিলির—লিলির না হলেও—লিলির কোনো দিনই হবে না। কিন্তু বুড়ো হয়ে যাবার কথায় প্রতিবাদ করার কিছু নেই—ওটা পাকা কথা। তবু বয়স বাড়ার কথাটা মেয়েদের কাছে পছন্দসই কথা নয়, লিলিকে কাজেই চেপে যেতে হয়।

আর ততদিনে কি ওই ইষ্টক সমাধির মধ্যে মামা বেঁচে থাকবে? শিশির নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেঃ আমার তো বিশ্বাস হয় না।

এতক্ষণই বেঁচে আছে কিনা কে জানে! লিলি সদুত্তর দ্যায় ঃ মামা পিষ্টক হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়। ছাত চাপা পড়লে ছাতু না হয়ে যায় না।

তাহলে তো হয়েই গেছে। তবে তো বৃথা চেষ্টা। তাহলে আর একাজে হস্তক্ষেপ করা কেন? শিশির ইটের পিঠ থেকেহাত গুটিয়ে নেয়।

মামার কোনো দোষ ছিল না। সেই বুনো জংলিটাই অনর্থক মামার পেটে গিয়ে মামার স্বভাব বিগড়ে দিয়েছিল। সে-ই যত নষ্টের গোড়া।

এতক্ষণে লিলির মুখে তবু একটু মামার গুণকীর্তন শোনা গেল। পরলোকগত মাতুলের জন্যে শোক প্রকাশের সুযোগ এল তার।

হুঁ। মামা-লোকটা ভালোই ছিল রে। দোষে-গুণে মানুষ। শিশিরও মামার জন্য আফশোশ করে ঃ মামা হলে কী হবে, ভালোবাসতে জানত!

ভয়ানক। বলতে না বলতে লিলির চোখমুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে আসে ঃ এখানে আর দাঁড়িয়ো না দাদা। আমার ভারী কান্না পাচ্ছে।

চল আমরা এখান থেকে যাই। এই মৌলমীন থেকেই চলে যাব। এখানে আর কী জন্যে? আজই যে জাহাজ ছাড়বে তাইতে চেপে বাড়ির দিকে পাড়ি দিই চ।

জাহাজঘাটার দিকে ওরা পা চালায়। লোকের মুখে মুখে পথের বার্তা নিয়ে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলে।

বাঘকে কেন যে মামা বলে এতদিনে জানলাম। যেতে যেতে জানায় শিশির। আমাদের মামাকে দেখেই জানা গেল। কিন্তু যাই বল লিলি, মামার মতোই মামা ছিল আমাদের। অমন বাঘা মামা প্রায় হয় না।

মামার গৌরবে শিশির গর্ব বোধ করে।

তা ঠিক। লিলিও গর্বিত হয় ঃ কিন্তু আবার চাঁদকেও তো মামা বলে থাকে।

সে তোদের বেলা। যে আমাদের ভাগনেদের বেলা বাঘা মামা, কেবল আমাদের তাড়া করে ফেরে, সেই মামাই আবার তোদের ভাগনিদের বেলায় চাঁদা মামা—কথায় কথায় কেবল চাঁদা দ্যায়।

লিলি সলজ্জ হয়ে চুপ করে থাকে। ভাগনি-সুলভ অভিজ্ঞতায় এ কথা অস্বীকার করতে পারা যায় না।

কিন্তু আমাদের এই মামার বেলা সে কথা বলে চলে না। শিশির বুক ঠুকে মামার সমর্থন করে ঃ আমাদের মামাকে অমন পক্ষপাতী বলতে পারবে না কেউ। একদম একচোখোপনা ছিল না—দুজনকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেছে। তাই নারে লিলি?

এ কথাও অস্বীকার করা কঠিন। মামার সমদৃষ্টির কথা মনে পড়তেই লিলি শিউরে ওঠে।

জাহাজঘাটায় গিয়ে জানা যায়, রেঙ্গুনের জাহাজ ঠিক তক্ষুনি ছাড়বে। টেনাসেরিম থেকে আসা জাহাজ, সেখান থেকে ছেড়ে, রেঙ্গুন, একিয়াব, চট্টগ্রাম হয়ে সরাসরি কলকাতায় গিয়ে পৌঁছবে।

টিকিট করার সময় ছিল না—জাহাজের পাটাতন ওঠাচ্ছিল—ছুটোছুটি করে গিয়ে

ওরা উঠে পড়ে। ওরাও ওঠে, পাটাতনও ওঠানো হয়। জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ দিয়ে সরতে থাকে।

জাহাজের টিকিট চেকার যাত্রীদের টিকিটের খোঁজ নিয়ে ফিরছিল! ঘুরতে ঘুরতে শিশিরদেরও কাছে আসে—তাড়াতাড়িতে টিকিট করা হয়নি—জানাতে বাধ্য হয় শিশির। তাছাড়া—টিকিট কেনার টাকাও তো তাদের কাছে ছিল না।

অ্যাঁ? একি তোমরা সরকারি রেলগাড়ি পেয়েছ নাকি, যে বিনা টিকিটে লম্বা দেবে? ব্যাপার দেখে জাহাজের কর্মচারীটির আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।

শিশির হাতের আংটি খুলে দ্যায়ঃ এতে আমাদের টিকিট হয় না? কলকাতা পর্যন্ত টিকিট?

এতেও যদি না হয় আমার সোনার দুল আছে! লিলি কানের দুল নেড়ে বলে। বলতে গিয়ে দুলের দোলনা লেগে ওর সোনালি মুখ লাল হয়ে ওঠে।

২১

রেঙ্গুনী জাহাজের দরদস্তুর

জাহাজের কর্মচারী আংটিটা অঙ্গুলিগত করে বললেন, তোমাদের কিন্তু তলাকার ডেকে থাকতে হবে। তোমাদের টিকিট নেই কিনা।

খুব রাজি; ঘাড় নেড়ে জানাল শিশির।

জাহাজের উপরের ডেকে যত ডেক প্যাসেঞ্জার—সাধারণ যাত্রী যত। তার থেকে একটা থাক আলাদা-করা—বেশি ভাড়ার যাত্রীদের জন্যে—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনের সারি। আর নীচের ডেকটায় যত মালপত্র বোঝাই।

সেই মালঞ্চের অন্তরালে—মালের সামিল হয়ে এক কোণে শিশির ও লিলির জায়গা করে দেয়া হল।

এইখেনে তোমরা লুকিয়ে থাকবে, বুঝলে? সাবধান, অপরের ডেকে গিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মের না যেন। কর্মচারীটি বিশেষ করে ওদের বলে দিলেন। গতিবিধির ত্রুটি-বিচ্যুতিতে যদি ইতরবিশেষ ঘটে, যদি ওরা ধরা পড়ে ফের তখন আর উনি ঝুঁকি নিতে পারবেন না, সে কথাও বাতলে দিতে কসুর করলেন না।

না না। উঁকি ঝুঁকি মারব কেন? বলল লিলি ঃ ও সব খারাপ কাজে আমরা নেই।

অলঙ্কৃত আঙুলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কর্মচারী বলল ঃ এ তো গেল তোমাদের রেঙ্গুন পর্যন্ত যাবার ভাড়া। তারপর রেঙ্গুন থেকে একিয়াব—আচ্ছা সে তখন রেঙ্গ নে গিয়ে দিলেই হবে।

এই বলে লোকটি লিলির কানের দিকে প্রলুব্ধ চোখে তাকায়।

আমার দুল তো আছেই। তাই দেব। পরবর্তী ভাড়ার ভার লিলি নিজের স্বকর্ণে অর্পণ করে।

হ্যাঁ, তোমার দুলতো রয়েছেই! আমি সেই কথাই বলছিলাম। কর্মচারীটির খুশি-খুশি মুখ হাসি-হাসি হয়ে ওঠে ঃ তোমাদের মত ভালো ছেলেমেয়ের কাছে আবার ভাড়ার জন্য ভাবনা!

কেন, দুল কেন? আমার ফাউন্টেনপেন নেই? শিশির নিজের ফাউন্টেনপেন দেখায়।

ফাউন্টেনপেনটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে লোকটি বলে? উঁহু, এই কলমে রেঙ্গুন থেকে একিয়াব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া পোষাবে না। এ কী কলম? এতো পার্কার নয়। শেফারও নয়তো! এতো দেখছি আড়াই টাকা দামের জাপানি পাইলট পেন। পার্কার ডু ফোল্ড হলেও না হয় দেখা যেত চেষ্টা করে।

আমার হাতঘড়ির বদলে হয় না। শিশির নিকেলের রিস্ট-ওয়াচটা স্বহস্তে তুলে ধরে। হাত ঘুরিয়ে উঁচু করে ঘড়িটা দেখায়।

হ্যাঁ, ওটা পেলে হয়তো তোমাদের একিয়াব পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তাহলে তোমাদের আরও নীচে যেতে হবে। এর তলায় এঞ্জিন-ঘরের পাশে কয়লার ভাঁড়ারে থাকতে হবে তাহলে। তোমাদের তাতে একটুকষ্ট হতে পারে হয়তো। অবশ্যি এখান থেকে না, রেঙ্গুন থেকেই বলছি।

বারে! তা কেন, আমার দুল আছে তো! লিলি আবার দুলে ওঠে।

থাকলেই বা। দুল নিয়ে অত টানাটানি কীসের? শিশির লিলির দাতাকর্ণতায় বাধা দেয় ঃ আচ্ছা, যদি আমার ঝরনাকলম আর হাতঘড়ি দুটোই দিই—আর—আর যদি—। না, তা হয় না।

হ্যাঁ, তাহলে হয়। কর্মচারীটি জানায়।

তাই বলছিলাম লিলি ওপরে এই ডেকে থাক আর যদি আমি যদি নীচে কয়লার ঘরে যাই—?

না না না? লিলি চিৎকার করে ওঠে।

তাই তো বলছিলাম, তা হয় না। লিলি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। আমি পারি, হ্যাঁ, আমি খুব পারি! কিন্তু আমি একলা থাকতে পারলেও ওর মন কেমন করবে কিনা! ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। আর আমিও চাই না যে ও আমাকে ছাড়া কখনো থাকে। তাহলে?

তাহলে তোমরা দুজনেই এক সাথে থাকো। তাতে আমার আপত্তি নেই। রিস্টওয়াচ আর ফাউন্টেনপেন দুটো পেলে আমি তোমাদের দুজনকেই একসঙ্গে একিয়াব পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু তারপর?

তারপরে? তারপরে তো আর কিছু নেই! শিশির বিষণ্ণ গলায় বলে।

কিন্তু তারপরেও, একিয়াব থেকে চট্টগ্রাম রয়েছে।

আর আমার দুল জোড়া রয়েছে কী জন্যে? লিলি গরম হয়ে ওঠে। শুনি একবার?

লিলি? ওগুলো মার দেয়া—তোমার জন্মদিনের উপহার। মনে আছে?

মার কাছ থেকে কি আমি আর পাব না? আমার সব জন্মদিন কি ফুরিয়ে গেছে? আমার আরো কত জন্মদিন আসবে।

ছিঃ, লিলি! অমন কথা মুখেও আনিসনে।

মানে? আমার জন্মদিন আসবে না, তুমি বলতে চাও।

না না, ওই দুল দেবার কথা। আর যেন ও কথা না শুনি!

তাহলে—একিয়াব থেকে চট্টগ্রাম—তার কী হবে? লোকটা মনে করিয়ে দেয়। (মেমরী তার ভারী ভালো)

দেখুন, আমার জুতো! খুব দামি জুতো। বাবার কিনে দেয়া। আর আমার শার্টটাও কেমন চমৎকার দেখুন! খুব দামি সিল্ক। এগুলো দিলে হয় না।

ওগুলো? লোকটা ভুরু কুঁচকে নাক সিঁটকে তাকায়ঃ তা হলেও হতে পারে! খুব কষ্টসৃষ্টেই হবে। আমার সেজো ছেলেটা মাথায় অনেকটা তোমার সমান। সে পরতে পারবে। হাফপ্যান্টটাও দেবে তো? ওটা তোমার ততো মন্দ না।

নাঃ, হাফপ্যান্ট দেয়া যায় না। শিশির সলজ্জ দৃঢ়তার সহিত বলে।

আমি তোমাকে একটা গামছা দেব না হয়।

তাহলে হয়তো হতে পারে। শিশির প্রস্তাবটা পুনর্বিবেচনা করে দ্যাখেঃ বেশ পরিষ্কার গামছা?

পরিষ্কার বই কি? লোকটা প্রলোভনের সামগ্রীটির চতুর্দিক উন্মুক্ত করেঃ একটু আধময়লা এই যা! সারেংদের গা-মোছা কিনা! তা বলে কয়লাঝাড়া ঝাড়ন নয় কিন্তু।

ততটা নিন্দনীয় নয় জেনেও শিশির চুপ করে থাকে—গামছার বাঞ্ছনীয়তটাই চিন্তা করে বোধহয়।

লিলি কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে নাঃ দাদার প্যান্টের বদলে আমার জুতো দিলে হয় না? ওই পচা প্যান্টের চেয়ে এটার দাম অনেক বেশি! আপনার ছোটো মেয়ে পরতে পারবে।

লোকটি লিলির শৌখিন জুতোর দিকে কটাক্ষ করে। পাছে লোকটা না বলে বসে কিংবা দাদার দিক থেকে বাধা এসে পড়ে লিলি, তাই তক্ষুনি তক্ষুনি জুতো খুলে ফ্যালে—সেই দণ্ডেই ওদের পদচ্যুত করে দ্যায়।

জুতো জোড়া হস্তগত করে লোকটা ভ্রূক্ষেপ করেঃ বাঃ, বেশ বাহারি জুতো তো! মেয়ে কেন—আমার বউই পায় দেখেখন! আমার বর্মী বউ—তার খুদে খুদে পা!

তাহলে আর তাকে পায় কে! লিলি হেসে ফ্যালে। এই জুতো পায় দেখবেন কেমন খুর খুর করে চলচে।

হ্যাঁ, তাহলে তুমিও রিস্টওয়াচ ফাউন্টেনপেন—জুতো জামা সব দিয়ে দাও। নিয়ে যাবি এখুনি।

এখুনি? এখুনি কেন? এখনো তো আমরা রেঙ্গুনেই পৌঁছইনি। রেঙ্গুন থেকে একিয়াব। একিয়াব থেকে চট্টগ্রাম—তখন তো! তখনই দেব। শিশির বলে।

তা কী হয়? টিকিট লোকে গোড়াতেই কাটে। তা ছাড়া তোমরা ছেলেমানুষরা ভারী ছটফটে। তোমরা ঠিক ওপর-নীচ করবে, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারবে না। এধারে ওধারে উঁকি ঝুঁকিও মারবে, আমি জানি! আর ধরাও পড়ে যাবে সেটাও ঠিক।

বাঃ, তা কেন করব? ধরা পড়তে যাব কেন? তাতে তো আমাদেরই সর্বনাশ।

আর আমারই বা কী পৌষমাসটা শুনি? তোমরা ধরা পড় তাতে ক্ষতি নেই—তোমরা গোল্লায় যাও না! কিন্তু ওই জিনিসগুলো সেই সঙ্গে ধরা পড়লেই সমস্তই তো গেল! তাতে আমার লাভ? আর কি তখন ওগুলো আমার হাতে আসবে? কার হাতে যাবে কে জানে! তখন আমায় ক্ষতিপূরণ কে দেবে, শুনি?

অগত্যা শিশিরকে তখনই জামা-জুতো হাতঘড়ি আর ঝরনা-কলম হাতছাড়া করতে হয়। শিশিরের থাকে কেবল সেই হাফপ্যান্ট আর একটা সামারকুল। জালি-দেয়া গেঞ্জিটার উপরেও তার নজর পড়েছিল, কিন্তু একটু পরীক্ষা করেই সে ওটাকে বরখাস্ত করে দিল—নাঃ, অনেক কালের গেঞ্জি! তা নইলে এতো ফুটো-ফুটো কেন? গেঞ্জিটার আগাপাশতলা ছ্যাঁদা হয়ে গেছে—হাড় পাঁজরায় ঝাঁঝরা—

অপদার্থটিকে বাদ দিয়ে বাকি পদার্থটিকে কুক্ষিগত করে লোকটি সহাস্য হয়ে উঠল—

বেশ বেশ! তোমরা চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছুলে আমাদের জাহাজ কিন্তু কলকাতায় যাবে। তোমরাও তো কলকাতাতেই নামবে। তাই না? তাহলে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার ভাড়া?

সর্বস্বান্ত শিশিরের উপর দ্রুত বিচরণ করে লোকটার লোলুপ চাহনি লিলির কানে গোড়ায় গিয়ে আটকে যায়। লিলির দুলের সঙ্গে দোল খেতে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা আরো দূর—তার মনে আরো দুরাশা।

আমার দুল? লিলিও দোদুল্যমান।

তুই থাম। তোকে কর্তাত্বি করতে হবে না। তাহলে মশাই, চট্টগ্রামেই আমাদের নামিয়ে দেবেন।

চট্টগ্রামেই নেমে যাবে? লোকটা অবাক হয়।

হ্যাঁ, সেখানেই নামিয়ে দেবেন দয়া করে। সেখান থেকে পায় হেঁটে আমরা বাড়ি যাব।

পায় হেঁটে? চাটগাঁ থেকে আসাম? লিলি আকাশ থেকে পড়ে—পড়বার সাথে সাথেই তার পা ব্যথা করতে থাকে। বর্মার এত দৌড় ঝাঁপের পর আবার আরেক দফা হাঁটাহাঁটি—চট্টগ্রাম থেকে তাদের অট্টালিকা কদ্দূর কে জানে! ব্যাপারটা তার একেবারেই ভালো লাগে না।

পারবি না? এমন কী দূর? শিশির ওকে উৎসাহ দ্যায়। আমাদের মামা যদি আসাম থেকে পদব্রজে বর্মা আসতে পারে তাহলে আমরা কি চট্টগ্রাম থেকে হাঁটন দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব না? খুব পারব। এক হাঁটায় মেরে দেব—দেখে নিস।

হাঁটতে হবে না! লিলি বলেঃ সেখান থেকে রেলগাড়ি করেই আমরা বাড়ি ফিরতে পারব! চাটগাঁয় আমার এক পেনফ্রেন্ড আছে। সে নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবে!

চাটগাঁয় বন্ধু আবার তুই কোথ্থেকে পেলি? শিশিরের তাজ্জব লাগে।

চিঠিপত্রের ভেতরে দিয়ে।.....পেনফ্রেন্ড বলছিনে? লিলি বলে।

পেনফ্রেন্ডরা কিছু না। বলে প্লেজার-ফ্রেন্ডরাই কোনো কাজে লাগে না তো পেনফ্রেন্ড! সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়। তোর অভাবের সময়ে কোনো বন্ধুই নেই—বইয়ে পড়িস নি?

আমার বন্ধু সেরকম নয়। লিলি নিজের বন্ধু গুমোরে গুমরে ওঠে।

বই ধার চাইলেই বন্ধুত্ব চলে যায়! বই ধার দিলেও যায়—কিন্তু সেই সঙ্গে বইও যায়। আমারও পেনফ্রেন্ড ছিল রে! আমিও তাকে দু একটা ভাবের কথা লিখেছিলাম, তাইতেই সে চিঠি লেখা ছেড়ে দিলে! অভাবের কথা কিছু লিখিনি, তবু সে কী ভাবলে কে জানে—হয়তো ভাবলে ভাব জমিয়ে বইটই কিছু ধার নেবার মতলবে আছি।

ছেলেরা আবার বন্ধুত্ব করতে জানে? দূর দূর! লিলি এক ফুৎকারে যাবতীয় বালকসুলভ বন্ধুত্ব উড়িয়ে দ্যায়।

তোর মেয়ে বন্ধু না বেঁকে দাঁড়ায় শেষটায়! পেনফ্রেন্ড শেষে পেনফুল ফ্রেন্ড না হয়ে ওঠে।

হয়তো বয়েই গেল। আমার কানে কি কিছু নেই? চাটগাঁতেই এটা আমি বেচে দেব তাহলে। আর কারু কথা তখন শুনব না। পা আমার মাথায় থাক! হাঁটাহাঁটি আমায় পোষায় না বাপু।

২২
ছাগলের ভাসমান রাজ্য

দুরাশাপরবশ ব্যক্তিটি হতাশ হয়ে তাদের চট্টগ্রামের উপকূলে (ভবিষ্যৎ বাচ্যে) পরিত্যাগ করে যাবার পর শিশির-লিলি তাদের এলাকার এধারে-ওধারে ঘুরে ফিরে দেখতে বেরুল।

শিশির লিলিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, উপরে না গেলেই হল। উন্নতির মূল ওই যে সিঁড়িটি দেখা যাচ্ছে ওতে পদার্পণের লোভ সম্বরণ করলেই যথেষ্ট, তাহলেই নিশ্চিন্তি! উপর থেকে কেউ আর এখানে উঁকি-ঝুঁকি মেরে আমাদের দর্শন নিতে আসছে না নিশ্চয়!

হাঁটাহাঁটি লিলির ততটা না পোষালেও এক জায়গায় পা জড়িয়েই বা কতক্ষণ থাকা যায়? তাছাড়া, লম্বা লম্বা পা ফেলে ছোটোখাট হন্টন লিলির ভালোই লাগে।

একধারে প্যাককরা একগাদা পার্সেলের বাক্স—আরেক ধারে যত রাজ্যের ফলের ঝুড়ির ডালা উন্মুক্ত, উন্মুখ হয়ে কত রকমের ফল ওদের অভ্যর্থনা করছিল। তাদের দু-একজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে—এবং তাদের বাঁচিয়ে ডিঙি মেরে মেরে ওদের চলতে হচ্ছিল। শিশির লিলিকে বলল, বুঝেছিস তো! এরাই আমাদের এই কদিনের ফলার! এই সিঙ্গাপুরের কলারা! চট্টগ্রাম অবধি অভিযানের রসদ!

লিলি বলল! যাবার ভাবনাতেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। খাবার কথা মনেই পড়েনি।

কর্ম করলেই তার ফল আছে, বাবা বলেন না? তেমনি ফল থাকলে তার কর্মও

থাকবে। তবে মুশকিল এই—এত ফল, আর চারটি মাত্তর হাত! বেশি কর্ম করে উঠতে পারব না। এই দুঃখ!

এক জায়গায় আবার বস্তার পাহাড়! বস্তাবন্দি হয়ে সারি সারি কী বস্তুরা দাঁড়িয়ে আছে—শিশিররা মাথা ঘামানোর চেষ্টা করে। যাই থাক, বস্তা ফাঁক করে দেখার তাদের সাহস হয় না। তাদের নিজেদের যে অবস্থা, তাহলে হয়তো সেই পাপে নীচের কয়লার ঘরেই নির্বাসিত হতে হবে। এবং সেখানে খুব যে সুবিধে হবে না, তা বলাই বাহুল্য! কয়লারা কেবল যে দৃষ্টিকটু তাই নয়—তার উপরে—যারপরনাই অখাদ্য! এমন ফলতা ছেড়ে কয়লাঘাটায় কে যায়?

মোটা মোটা কাছির দড়া তাল-গোল-পাকানো—এখানে ওখানে সেখানে কুণ্ডুলী করে রাখা। লাফ মেরে মেরে ওরা চলছিল। ডেকের ধারটায় পৌঁছতেই দু-একটা চাপা গলার আওয়াজ ওদের কানে এল।

অর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌.....চেঁচিয়ে উঠল কে যেন।

পাঁঠা নাকি? বলল লিলি।

পাঁঠা তো নিশ্চয়! শিশির বলে ঃ কিন্তু দুপেয়ে না চারপেয়ে?

কৌতূহলী হয়ে কণ্ঠধ্বনি অনুসরণে আর একটু এগুতেই—ব্যা—ব্যা—ব্যা!—পরিষ্কার ভাষায় ছাগলাদ্য ব্যাকরণ ওদের কানে এল—এবং তারপরেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হতে সংশয়ের তিলমাত্র রইল না।

ছাগলের পাল তাদের চোখের সামনে।

ওমা! এতো ছাগল কেন এখানে? লিলি গালে হাত দ্যায়।

জাহাজে করে রপ্তানি হচ্ছে বোধহয়। শিশির বলে।

ডেকের সেধারটা বেড়ার মতো করে ঘেরাও করা—তার ভেতরে অগুনতি ছাগল। ওই অল্প পরিসরের মধ্যে ঠাসাঠাসি বন্দী দশায় বেচারিরা মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। লম্ফঝম্ফ দূরে থাক, স্বভাবসিদ্ধ চেঁচামেচির পর্যন্ত কারো উৎসাহ ছিল না। কেবল ওদের মধ্যে দু-একজন—নেতৃস্থানীয়ই বোধহয়—বিশুদ্ধ ব্যাকরণে মাঝে মাঝে অসন্তোষ প্রচার করছিল। মুখপত্র কিংবা মুখপাত্র হিসেবে প্রেরণাদানের কর্তব্য পালন মাত্র।

কোথায় এদের ধরে বেঁধে চালান দিচ্ছে দাদা?

আমিও তো তাই ভাবছি। কোথায় আবার ছাগল নেই? কোন্ মুলুকে ছাগলাভাব? সব দেশেই তো দেদার পাঁঠা—খেয়ে ফুরোনো যায় না?

মাগো? কী বিচ্ছিরি গন্ধ। লিলি নাকে রুমাল দ্যায়।

ছিঃ! পাঁঠা বলে ওদের অবজ্ঞা করিসনে। পাঁঠা বলে কি মানুষ নয়? একবার ওরাই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। —পাঁঠারা অতি নমস্য ব্যক্তি। শিশির মস্কারের দ্বারা নিজের কথায় সায় দ্যায়।

দক্ষযজ্ঞের গল্প শুনিসনি বাবার কাছে? দক্ষ তার যোগ্যতার কী পুরস্কার পেয়েছিল শিবের হাতে? পাঁঠার মাথা। তার মানে কী? পাঁঠার মতো দক্ষলোক দুনিয়ায় আর

নেই। প্রত্যেক যোগ্য লোককে ভালো করে যাচিয়ে দ্যাখ--দেখবি আসলে একটা পাঁঠা। বাবাই একথা বলে—এবং আমি বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। আমি তো পাঁঠার মাংস পেলে আর কিছু পেতে চাইনে, অমন নিঃস্বার্থপর পরোপকারী জীব পৃথিবীতে আর কে আছে? আমরা ওদের বলিদান করি--তার বদলে ওরা আমাদের বলদান করে।

পাঁঠা নয়তো বলদ! লিলি এক কথায় বলে দ্যায়!

বলতে পারিস, গোরুরা যদি আপত্তি না করে। বাবা বলেন, পাঁঠারা সামান্য নয়। পৃথিবীর সমস্ত কাণ্ডকারখানা কারা চালায়—যুদ্ধবিগ্রহ যত কারা বাধিয়ে রাখে? পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাজ কারা করে? পাঁঠারা! ছোটোখাটো কর্তৃত্বের চূড়া থেকে বড়ো বড়ো শাসনচক্রের চূড়ান্তে কারা বসে আছে? হয় একটি—নয় এক দল—সেই পাঁঠা। পাঁঠার লীলা বোঝা ভার। এক মুখে ওদের মাহাত্ম্য কীর্তন করা যায় না। শিশিরের গম্ভীর মুখে প্রবীণের বুলি।

মানুষের তাহলে মানুষ হবার এখনো ঢের দেরি আছে, কী বল দাদা? এখনো ওদের পাঠ্যাবস্থা চলচে তাহলে? লিলিও বাবার মুখ থেকে শোনা শক্ত একটা কথা উচ্চারণ করে দ্যায়।

ফলের ঝুড়ির ওখান থেকে কটমট করে আমাদের দিকে চাইছে ও লোকটা কে রে? শিশির চকিত হয়ে ওঠে।

এই মাত্র উপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল না?

হুঁ। দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে! শিশির রবীন্দ্রনাথের পংক্তি দিয়ে লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করে।

গ্র্যান্ড মামার আড্ডায়। লিলির মনে হয়।

ঠিক ধরেছিস। গ্র্যান্ড মামাদের দলের কোনো লোক। তা না হয়ে যায় না। আমাদেরকেও চিনতে পেরেছে মনে হচ্ছে।

তাহলে—তাহলে কী হবে? লিলি শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

নিশ্চয় ও একা নেই এখানে। গ্র্যান্ড মামার দলবল সবাই এই জাহাজেই যাচ্ছে তাহলে। ওদের তো পরশুদিন পাড়ি দেবার কথা শুনেছিলাম—তাহলে আজকেই—চলল কেন? অ্যাঁ?

আমাদের ধরবার জন্যে নাকি?

নিজেরা ধরা পড়বার ভয়ে। পুলিশের তাড়ায় বোধহয়। গ্র্যান্ড মামাও নিশ্চয় এই জাহাজে চলেছে!

কিন্তু লোকটা অমন রেগে মেগে তাকাচ্ছে কেন দাদা?

শিশিরকে এর উত্তর দিতে হয় না—লোকটা নিজেই প্রকাণ্ড একটা ছোরা হাতে, বোধ হয় সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবার উদ্দেশেই ওদের দিকে এগুতে থাকে।

২৩
পাঁঠায় পাঁঠায় হল ধুল পরিমাণ

লোকটা ছুরিকা হস্তে, রজনীর মতো, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। শিশির আর লিলি চারিধার অন্ধকার দ্যাখে—সেই আঁধারের মধ্যে কেবল সেই ছুরিখানার চাকচিক্যই তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

কই? কই সেই গুপ্তধন? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস বের কর!

লোকটার প্রথম কথাই কাজের কথা। বাজে কথার লোক সে নয়, বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় তার বিরল—ছুরির ইঙ্গিতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ সে দ্যায়।

এই তো। হাফ্‌প্যান্টের দুই পকেট থেকে রত্নডিম্ব দুটিকে উদ্ধৃত করে তুলে ধরে শিশির।

এই দুটো? দুটো কেবল? আর সব কই?

আর! আর তো সব গ্র্যান্ড মামার কাছে।

গ্র্যান্ড মামা? সে আবার কোন ছুঁচো?

ছুঁচো কিনা জানিনে—তার নাম বক্কেশ্বর আইচ্।

ইয়ার্কি হচ্ছে? তিনি তো আমাদের দলের সর্দার! তার সঙ্গে কী সম্পর্ক তোদের? খেঁকিয়ে ওঠে লোকটা।

মামাতুতো সম্পর্ক। তিনি আমাদের মামার মামা। তিনিই তো এই দুটো আমাদের প্রেজেন্ট দিয়েছেন।

প্রেজেন্ট দিয়েছেন! হাতের ছুরিখানা আমূল নিজের বুকে বিদ্ধ হলেও লোকটা বোধ করি এতখানি আহত হত না। তিনি প্রেজেন্ট দিয়েছেন তোমাদের! বিমূঢ় কণ্ঠে সে বলে। তার হাতের ছুরিখানা—না হাত থেকে নয়—হাত সমেত খসে পড়ে। হাত লাগাও হয়ে হাঁটুর কাছে ঝুলতে থাকে।

তিনি ছাড়া আবার কে দেবে! কার দেবার ক্ষমতা? বলে শিশির। সে কথাও তো মিছে নয়! তাদের কর্তা ছাড়া এই ব্যাপারে ক্ষমতাবান আর কারো কথা সে কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে—স্বহস্তে—এই লোভনীয় মণিরত্ন—নিজের কাছে না রেখে, নিজের অনুচরদের না দিয়ে—কোথাকার কোন ভাগনের ভাগীদারকে ডেকে বিলিয়ে দেবেন এমন পরামাশ্চর্য কথাও তো ধারণা করা কঠিন। কিছুটা বিশ্বাস—কিছুটা অবিশ্বাস—আর সমস্তটাই বিস্ময়ে ওতপ্রোত হয়ে সে বলে ঃ তবে যে তিনি বললেন তোমরা বাগিয়ে নিয়ে পালিয়েছ।

তা কী করে হয়? লিলি বলে ওঠে এখন ঃ আমাদের গ্র্যান্ড মামা কত বড়ো আর কী জোয়ান—আর আমার দাদা কত ছোট্ট—কতটুকু! সে কি কখনো তাঁর হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে?

সেও তো একটা কথা। লোকটার মুখ দেখে মনে হয় সে যেন আরো বেশি মর্মাহত হয়েচে। তার মুখ থেকে প্রতিবাদ আসে না।

শিশিরের মুখ থেকে আসে ঃ তুই যে কী বলিস লিলি! আমি বুঝি আর বড়ো হইনি? আমি বুঝি আর জোয়ান নই? কী যে বলিস তুই!

তাহলেও, আমার দাদা ছোটো জোয়ান তো! লিলি দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করে—দাদার অভিমান এবং দাদা—দুই কূল বাঁচিয়ে রাখতে চায় ঃ সেটা তো তুমি মানবে। একটা ছোট জোয়ান—তা সে যত বড়োই জোয়ান হোক—আসল একটা বড়ো জোয়ানকে কি গায়ের জোরে হারিয়ে দেবে?

দেবেই তো! দিয়েছেই তো! শিশির বক্ষের বিস্তৃতির উপরে বাহুর স্ফীতি আমদানি করে আনে ঃ হাতের মাস্‌ল্ ফুলিয়ে বলে ঃ তা না হলে এগুলো এই শ্রীহস্তে এল কী করে—শুনি?

এই অযাচিত বীরত্ব লিলির ভালো লাগে না—ঝুলন্ত ছুরিখানা থেকে তখনো আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অকাল যৌবনের ফলে, অকালবার্ধক্যের আগেই দাদার অকালমৃত্যু না ঘটে যায় এই ভয়ে সে সিটিয়ে ওঠে ঃ আহা, তুমি গ্র্যান্ড মামাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস কর না বাপু—তিনিই এগুলো দাদাকে প্রেজেন্ট দিয়েছেন কী না। তাহলেই তো ফুরিয়ে যায়। তিনিও এই জাহাজেই প্রেজেন্ট আছেন তো।

এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে লোকটার মনে গুমরে গুমরে উঠছিল—এই সবচেয়ে বেদনাদায়ক কথাটা—আলপিনের চেয়েও তীক্ষ্ণতর—ছুরির চেয়েও মর্মভেদী—

এই উপলব্ধি! সর্দার হয়ে নিজের দলবলের সঙ্গে তিনি ছলনা করবেন—তাদের ন্যায়সঙ্গত ভাগ, ন্যায্য ভাগ্য থেকে বেদখল করে এভাবে বরখাস্ত করবেন; এই আইডিয়া বরখাস্ত করতেই তার প্রাণে ব্যথা লাগছিল। অনন্তরঙ্গদের সাথে এই ধরনের রঙ্গ, নেতৃস্থানীয় তাঁর কাছ থেকে অন্তত আশা করা যায় না। এই কি তাঁর নেতৃসুলভতা?

লাঞ্ছিত কুকুর যেমন করে ল্যাজ গুটিয়ে নেয়, সেই ভাবে ছুরিখানাকে নিজের অন্তর্গত করে লুকিয়ে নিয়ে ম্লান মুখে লোকটা উন্নতির পরাকাষ্ঠা সেই সিঁড়িটা ধরে উপরে ডেকে রওনা হয়।

একটু পরেই গ্র্যান্ড মামা—অধোগতির উপায়—সেই সিঁড়িটা দিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।

তোমরা করেছ কী! হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি বলেন ঃ কী সর্বনাশ করেছ বলো দেখি?

সর্বনাশ! কেন, কী হয়েছে? ওদের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে ঃ আপনাকেও ছুরি নিয়ে তাড়া করেছে না কি?

আমাকে! আমাকে আর তাড়া করতে হয় না। তারা দল বেঁধে তোড়জোড় করে তোমাদের তাড়া করতেই আসছে, তবে তোমাদের কাছে হতাশ হলে—হয়তো আমাকেও তাড়া করতে পারে বলা যায় না।

তাহলে তো মুশকিল! ওদের কণ্ঠে অকৃত্রিম সহানুভূতি।

মুশকিল বই কি! তোমাদের কাছে মোটে দুটি রত্ন—আর আমার রত্ন অনেকগুলি! দুটি নিয়ে কি তারা তুষ্ট হবে? তখন চটেমটে কী করে বসে বলা যায় না, তোমরা এক কাজ কর, ওধার দিয়ে—ওধারেও একটা সিঁড়ি আছে—তাই ধরে গা ঢাকা দিয়ে আমার কেবিনে চলে এস। দশ নম্বর কেবিন—উপরে বাঁ ধারে। সেখানে এই কদিন তোমাদের লুকিয়ে রাখব। হাজার হোক, তোমরা আমার ভাগনের ভাগনে। যতই বজ্জাত হও, বংশ লোপ হতে দিতে পারিনে তো।

আমি পালালুম। তারা এসে পড়ল বলে। তোমরা ওধার দিয়ে চলে এস চটপট। এই বলে গ্র্যান্ডমামা সিঁড়ি দিয়ে সর সর করে উঠে গেলেন।

যাই বল, গ্র্যান্ডমামা লোকটা যতই দুষ্টু হোক, আসলে কিন্তু খুব ভালো। শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জানায়।

ও ধারের উক্ত উন্নতির সোপান ঘেঁষতে গিয়েই দেখা যায় সেই পথেই গ্র্যান্ড-মামার রত্নগুলি দুদ্দাড় করে নেমে আসছে। লিলিরা আর কোথায় পালাবে—একেবারে জাহাজের রেলিং-এর উপরে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর যা একমাত্র উপায়।

নেপোলিয়ন কর্সিকা থেকে লম্বা এক সাঁতারে ফ্রান্সে গিয়েছিল—না রে? জিজ্ঞেস করে শিশির!

লিলি চুপ করে থাকে—শিশির যে নেপোলিয়ন নয়, সে কথা জানানোর তার সাহস হয় না। তাহলে চাই কি, সেই দণ্ডের হয়তো শিশির, অন্তত জলযুদ্ধে, নিজেকে নেপোলিয়ন প্রতিপন্ন করতে প্রস্তুত হবে।

মৌলমীন থেকে আমরা কতটা এসেছি? ক মাইল বল তো? এখান থেকে রেঙ্গুন সাঁতরে যাওয়া যায় না কি?

লিলি একেবারে নিরিবিলি।

গেলে তোকে অবশ্যি পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাব, তুই ভাবিসনে। তোকে ফেলে যাব না নিশ্চয়। শিশির ওর ভাবনার কারণ দূর করে ঃ আমি কি ভালো সাঁতার জানিনে নাকি? বলি, গ্র্যান্ড মামাকে সলিল সমাধি থেকে উদ্ধার করেছিল কে? কে শুনি?

লিলি ভরসান্বিত হয় কি না বলা যায় না, কিন্তু মতামত প্রকাশের আগেই ডাকাতরা ওদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ে।

দ্যাখো, তোমরা যদি আর এক পা এগিয়েছ, আমি তাহলে এক্ষুনি—আমার এ দুটো কী, দেখছ তো?—এক্ষুনি এগুলি ছুঁড়ে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেব। শিশির বেঁকে দাঁড়ায়।

সাত রাজার ধন এক মানিক! সবিস্ময়ে সমস্বরে ওরা বলে উঠে।

এক নয়, দুই মানিক! শুধরে দেয় শিশির। মানিকজোড় বলতে পার বরং।

জলে ফেলে দেবে? ওরা চমকে যায়—যদিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না—তবুও ওরা থমকে দাঁড়ায়। আর এক পা এগোয় না।

একেবারে জলাঞ্জলি দেব। শিশিরের কণ্ঠে কুণ্ঠার লেশ নেই।

তাহলে? তাহলে তোমাদের ধরতে না পারলে আমরা ওগুলো পাব কী করে? হাতাবো কী করে শুনি? .....এ কী রকম কথা?

তার আমি কি জানি! শিশির যেন তাদের নাগালের বাইরে এক সামুদ্রিক চড়ায় গিয়ে চড়াও হয়েছে—এমনি তার চড়া গলা।

আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?—ওদের মধ্যে মোটাসোটা মতো একজন এক উপায় বাতলায়ঃ তার চাইতে তুমি মানিক দুটো আমার হাতে দাও—আমি না হয় তোমাদের দুজনকে তুলে জলে ফেলে দিচ্ছি। তাহলে হয় না? .....জলে ফেলা নিয়ে তো কথা?

ইয়ার্কি পেয়েছ? ধমকে দ্যায় শিশির।

তাহলে কি অনন্তকাল ধরে আমরা এই রকম স্থির হয়ে এইরূপ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকব?

একটু আগে যে ছুরি বাগিয়ে আগিয়ে এসেছিল তারই ক্ষুব্ধ কণ্ঠ থেকে এই প্রশ্ন বেরয়।

বেশিক্ষণ নয়, এই যতক্ষণ পুলিশ অথবা রেঙ্গুন এই দুটোর একটা না এসে পড়ছে ততক্ষণ একটু কষ্ট করে দাঁড়াতে হবে বৈকি! শিশির বলে। কিন্তু কতক্ষণ আর?

পুলিশ! নামোচ্চারণেই ওদের মধ্যে শিহরণ খেলে যায়—দেহে মনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

অথবা রেঙ্গুন! শিশির ওদের আশ্বস্ত করতে চায়ঃ রেঙ্গুনও আসতে পারে। যদিও কোনটা আগে আসবে বলা কঠিন।

২৪

বৃহৎ ছাগলাদ্য যুদ্ধ

কিন্তু ততক্ষণই বা কী করে ওই সব বদ্‌খৎ মুখ নিজের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে সহ্য করা যায়? আর ততক্ষণ ধরে দণ্ডায়মান হয়ে থাকাও তো চাট্টিখানি নয়! ঘুম পেলে?

দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তোমরা চি-বুড়ি খেলা জান? সে জিজ্ঞেস করে।

ঘাড় নাড়ে তারা। বুড়ি জিনিসটা তাদের জানা বটে—মেয়েরা বুড়ো হলে যা হয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু তা তো খেলাধুলোর বাইরে।

উঁহু সে বুড়ি নয়। ভেবে দ্যাখো, আমার হাতে এই দুটি মাত্র মানিক—আর তোমরা এতগুলি সৎপাত্র। কাকে রেখে কাকে দেয়া যায়?

তার চেয়ে এক কাজ করা যাক—খেলাটা তোমাদের আমি সমঝিয়ে দিচ্ছি। এই লিলি হল গিয়ে বুড়ি—ওই সিঁড়িটার কাছে দিয়ে দাঁড়াক। আর তোমরা ওই ধার

থেকে—যে ধারটায় ছাগলরা আটকানো আছে—ওখান থেকে এক এক বারে একজন করে চি-দিয়ে আমাকে ছুঁতে আসবে। আমি পালিয়ে পালিয়ে যাব—যে এক দমের মধ্যে আমাকে ছুঁতে পারবে এই মানিক দুটো তার হবে। আর দম ফুরিয়ে গেলে আমি যদি তাকে ছুঁয়ে দিতে পারি তা হলে সে মরা। তার খেলা ফুরিয়ে গেল, সে আর মানিক পাবে না। কেবল আমি ছোঁবার মুখে যদি সে ছুটে গিয়ে বুড়িকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে তবেই তার বাঁচোয়া। পালিয়ে নিজের কোঠায় পৌঁছে গেলেও অবশ্যি বেঁচে গেল! তখন সে আবার চি দিতে পাবে। চানস পাবে আবার। কেমন এতে তোমরা রাজি আছ?

দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে দৌড়াদৌড়ি ভালো—ঢের বেশী মজার, এক কথায় তারা রাজি হয়ে গেল, আর তাছাড়া, এভাবে মানিকটা হাতে এলে অপর কারো সাথে ভাগবখরা করতে হবে না—ঢের ফ্যাসাদ বেঁচে যাবে—সেও এক মস্ত সুবিধা।

চি-বুড়ি খেলা শুরু হতে দেরি হয় না।

প্রথম একজন চি দিয়ে তার গণ্ডী থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে—কিন্তু শিশির খুব হুঁশিয়ার! দৌড়ে ধরা তাকে সহজ নয়। ফলের ঝুড়ি-পার্শেলের বাক্স সে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়—রাস্তাদের উপর দিয়ে টপাটপ চলে যায়—আর চি-ওয়ালা তীক্ষ্ণ সুরে শুরু করে বটে কিন্তু শেষটায় চিচি করতে থাকে—ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে তার

স্বর বাতাসে মিলিয়ে যায়। তখন আবার শিশিরের উলটে তাড়ার পালা আসে। শিশিরের তাড়নায় তার তখন পালানোর পথ নেই। কেউ বা ফসের খোসায় পিছলে পড়ে, কারো বা পার্শেলের বাক্সে ধাক্কা লাগে, কেউ বা বুড়ির টক্করে জখম হয়ে বস্তার পাহাড়ে গিয়ে আটকে যায়। আর ধরা পড়লেই মরা!

একে একে ওদের সাতজন এইভাবে শিশিরের হাতে মারা পড়ল। ম্লান মুখে পাঁঠাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাছে গিয়ে বসে রইল তারা—পাঠশালার বেড়া ঠেসান দিয়ে। নিজেদের বাদ বাকিদের মৃত্যু কামনা ছাড়া আর কোনো কামনা তাদের মনে নেই।

বাকি সাতাশ জনেরও সেই দশা হল। পূর্বগামীদের আন্তরিক প্রার্থনাতেই কি না বলা যায় না।

আর একজন কেবল তখনো বেঁচে—পোয়ায় রকমের নাদুস নুদুস একজন। বেচারা দু একবার এর মধ্যে চি দিয়ে এসেছিল—কিন্তু ওর চি বেশিদূর এগোয়নি। ও নিজে তার চেয়ে আরো কম এগিয়েছে।

সেই হৃষ্টপুষ্ট লোকটি বলে : আমি অত দৌড়তে পারব না। হাত দিয়ে ছোঁয়া আমার পোষাবে না বাপু! আমি বাঁশ দিয়ে ছোঁব। এই লম্বা বাঁশটা দিয়ে।

এই বলে শিশির তার প্রস্তাবে রাজি কিনা জানবার আগেই, শত্রু মিত্র কারো প্রতিবাদের অপেক্ষা না করে ছাগলদের বেড়ায় বিলম্বিত একখানা বাঁশ সে খুলে নিল। তারপরে সেই বাঁশখানা স্বহস্তে ধরে—শিশিরের দিকে বাড়িয়ে—চি-দানের উপক্রম করল সে। কিন্তু উপক্রমের সূত্রপাতেই হুলুস্থুল!

এই লিলি, দেখছিস কী! সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়ে—চটপট। ছাগলরা ছাড়া পেয়েছে দেখছিস নে? শিশিরের চিৎকার শোনা যায়।

মুক্তি পেতেই, ছাগলের পালের উৎসাহ দ্যাখে কে! ডেকের উপর দিয়ে ছাগলের তরঙ্গ যেন ছুটে আসতে লাগল। আর গোড়ার ধাক্কাতেই বেড়ায় ঠেসান দেয়া বীরেরা ভেসে গেলেন প্রথমে। লিলি ওধারের সিঁড়ির উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে—শিশির এ ধারের।

ছাগলের খরস্রোত চারধার প্লাবিত করে চলল। ফসের বুড়ি তছনছ করে—প্যাকিং বাক্সদের ভেঙেচুরে—বস্তাদের দুরবস্থায় ফেলে—দিগ্বিদিক ভাসিয়ে দিয়ে চলল। আর গ্র্যান্ড মামার দলবল—মায় সেই বংশধারী স্থূলকায় পর্যন্ত—সেই স্রোতের মুখে বেকায়দায় পড়ে ভাসতে ভাসতে চলল। ঢেউয়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মতোই।

তাদের কেউ কেউ যে সেই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করেনি তা নয়—কিন্তু তোড়ের মুখে পারবে কেন? দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই গুঁতো মেরে ফের তাদের শুইয়ে দিয়েছে। কাত হয়ে, চিত হয়ে, উপুড় হয়ে—ওলটাতে পালটাতে—নানারকমে তারা ভেসে চলেছে। বাঁশ হাতে সেই মোটা লোকটিও ভাসতে দ্বিধা করছে না।

তির বেগে ভেসে যেতে যেতে অবশেষে—তারা—একেবারে জাহাজের রেলিং-এর কিনারায়—

সর্বনাশ হল! চেঁচিয়ে উঠল লিলি।

এই যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে? শিশির উচ্ছ্বাসে আনন্দমঠ হয়ে ওঠে : হরে মুরারে—হরে মুরারে!!

বঙ্কিম কটাক্ষে সমস্ত দৃশ্যটা দেখতে দেখতে বঙ্কিমের আনন্দমঠ তার মনে পড়ে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! লিলিও আওয়াজ ছাড়ে—সেও কিছু কম যাবার মেয়ে নয়।

রেলিংয়ের কিনারায় এসে সে এক দারুণ সংঘর্ষ—ওধারে সমুদ্রের দুর্দান্ত কল্লোল—এধারে ছাগলদের উত্তাল তরঙ্গ—মাঝখানে ছত্রভঙ্গ গ্র্যান্ড মামার দলবল। ছাগলাদ্য ঢেউয়ের ধাক্কায় রেলিংয়ের উপরে গিয়ে বারম্বার তারা আছড়ে আছড়ে পড়ছে—

দেখতে দেখতে রেলিংয়ের খানিকটা মড় মড় করে ভেঙে পড়ল। এবং তারপরে আর দেখতে হল না। পঁয়ত্রিশটি বীরের একজনেরও আর টিকি দেখা গেল না। সবাই হুড়মুড় করে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে পড়ল! পেছনে পেছনে পাঁঠারাও প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিতে লাগল। একটাও পিছু ফিরে তাকাল না। রক্ষা পেল না কেউ। এমনকী সেই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ লোকটি পর্যন্ত সবংশে লোপ পেয়ে গেল।